বাঙ্গালীর খাদ্য

A Handbook on the Principles of Bengali Dietetics

By
Kaviraj Indubhusan Sen, Ayurvedashastri,
Lecturer, Bengal Medical Institution and Hospital.
Late Professor, Calcutta J. B. Astanga Ayurveda College
and Calcutta Vaidyashastrapitha.

(Fifth Edition)

বেঙ্গল মেডিক্যাল ইনিস্‌টিটিউসনের লেকচারার,
কলিকাতা যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গআয়ুর্ব্বেদ কলেজ ও বৈদ্যশাস্ত্রপীঠের
ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক, "আয়ুর্ব্বিজ্ঞান সম্মিলনী" পত্রিকার সম্পাদক,
"পারিবারিক চিকিৎসা," "বাঙ্গলা দেশের গাছ পালা,"
"নেশা", "সরল স্বাস্থ্যবিজ্ঞান" প্রভৃতি
গ্রন্থ প্রণেতা—

কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী
ভিষগ্‌রত্ন, এল্‌ এ, এম্‌, এস্‌ প্রণীত।

(পঞ্চম-সংস্করণ)

মূল্য ৸৹ আনা

প্রকাশক—শ্রীদিগিন্দ্রনাথ কাব্য-ব্যাকরণ-জ্যোতিস্তীর্থ
"আরোগ্য নিকেতন"
১৯১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ কোঙার
উমাশঙ্কর প্রেস
১২নং গৌরমোহন মুখার্জ্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা

উৎসর্গ পত্র

—:০:—

নিষ্ঠাবান্ সাহিত্য-সেবক

ও

সাহিত্য-বন্ধু

শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়

করকমলেষু—

গুণমুগ্ধ—

ইন্দু

ভূমিকা

[মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন-সরস্বতী এম-এ, এল্-এম-এস্ মহোদয় লিখিত]

বাঙ্গালীর খাদ্য-সমস্যা যে কি গুরুতর ব্যাপার, তাহা যাঁহারা এবিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁহারাই জানেন। উপযুক্ত খাদ্যের অভাবেই আজ বাঙ্গালীর এ ভীষণ দুর্দ্দশা। এত রোগ-শোকের মূলেও এই খাদ্যাভাব, পক্ষান্তরে যাঁহারা ভাল খাদ্য প্রচুর পরিমাণে খাইতে পান, তাঁহারাও অনভিজ্ঞতা বশতঃ উপযুক্ত খাদ্য খান না। তাই আজ ছোট বড় সকল বাঙ্গালীই রুগ্ন।

কবিরাজ শ্রীমান্ ইন্দুভূষণ সেন এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে খাদ্য-সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদের মত কি—তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং সঙ্গেসঙ্গে ডাক্তারী মতও দেখাইয়াছেন। এইরূপ তুলনাত্মক জ্ঞান-বিস্তারের বিশেষ প্রয়োজন আছে। রোগে পথ্যাপথ্য নির্ণয় সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদের গৌরব সুপ্রসিদ্ধ। অন্যদিকে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য দিনচর্য্যা, ঋতুচর্য্যা প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদে যেরূপ আছে, অন্যত্র সেরূপ দেখা যায় না। হয়তো বর্ত্তমান সময়ে সাধারণ লোকের নিকট এ সকল কথা নূতন বোধ হইবে। কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এ সকল মানিয়া চলিতেন বলিয়াই সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবী হইতেন।

শরীরের সুদৃঢ় গঠন ও রক্ষণের জন্য জান্তব আহার একান্ত আবশ্যক। মৎস, মাংস, ডিম্ব ও দুগ্ধ এসকলই জান্তব খাদ্য, তন্মধ্যে দুগ্ধ নিরামিষ

বলিয়া ধরা হয়। যাঁহারা বিধবা বা সন্ন্যাসী, তাঁহারাও দুগ্ধ পান করেন। একটা কথা আছে—'দুধে মাছে বাঙ্গালীর শরীর'—সেই দুধের ও মাছের অভাবে ধনী-দরিদ্র—সকলেই এখন রোগের জ্বালায় বিব্রত। সেই দুধ-মাছ পুনরায় সুলভ না হইলে, বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে না। আর প্রচুর দুধ-মাছের প্রয়োজনীয়তাও বা বুঝেন কয়জন ?

এইসকল তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য স্বর্গীয় ডাঃ ইন্দুমাধব মল্লিক, রায় বাহাদুর ডাঃ চুণীলাল বসু প্রভৃতি যাঁহারা অগ্রণী হইয়া দেশের লোককে খাদ্যতত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র, আর আজ আয়ুর্ব্বেদের দিক দিয়া কিছু কিছু খাদ্যতত্ত্ব বুঝাইবার চেষ্টার জন্যও শ্রীমান ইন্দুভূষণের উদ্যম প্রশংসনীয়,—সন্দেহ নাই।

প্রথমবারের নিবেদন

"বাঙ্গালীর খাদ্যের" প্রথমাংশ "আয়ুর্ব্বিজ্ঞান" নামক মাসিকপত্রে "খাদ্যদ্রব্যের গুণাগুণ" নামে ধারাবাহিকরূপে বাহির হইয়াছিল। তখন অনেকে উহা পুস্তকাকারে বাহির করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। উহা পুস্তকাকারে বাহির করিবার পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ রসায়নতত্ত্ববিদ্ রায়বাহাদুর ডাঃ শ্রীযুত চুণীলাল বসু মহোদয়কে পুস্তকখানি দেখিয়া দিবার জন্য পাঠাইয়া দিই। তিনি অনুগ্রহ করিয়া এই পুস্তকের অধিকাংশ পড়িয়া আবশ্যকমত পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া আমাকে লিখিয়াছেন,—"আপনার পুস্তক পাঠে লোক উপকৃত হইবে।" তাঁহার এই শ্রম-স্বীকার ও উৎসাহদানের জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ। এইস্থানে আর একটি বিষয় উল্লেখ করিতেছি যে, এই পুস্তকের খাদ্য বিশ্লেষণের যে "চার্ট"-সমূহ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাও তাঁহার প্রসিদ্ধ 'খাদ্য পুস্তক হইতে গ্রহণ করিয়াছি।

মদীয় আচার্য্য মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন-সরস্বতী মহোদয় একটি 'ভূমিকা' লিখিয়া দিয়া এই পুস্তকের গৌরববর্দ্ধন করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে আমার ভক্তি-প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি।

১লা জানুয়ারী, ১৯২৮
আরোগ্য-নিকেতন
শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীইন্দুভূষণ সেন

পরিপাক ক্রিয়া

১—লালাগ্রন্থি ; ৩—অন্ননালী ; ৫—পিত্তস্থলী ; ৬—পাকস্থলী ; ৭—যকৃৎ ; ৮—অগ্ন্যাশয় ; ৯—গ্রহণী ; ১০—বৃহদন্ত্র ; ১১—ক্ষুদ্রান্ত্র ; ১৩—মলাশয় ; ১৪—মলদ্বার।

বাঙ্গালীর খাদ্য

প্রথম অধ্যায়

খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজনীয়তা

খাদ্য দ্রব্যই আমাদের শরীর রক্ষার মূল। শারীরিক পুষ্টিসাধন এবং শারীরিক কার্য্যক্ষমতা লাভ—খাদ্য ভিন্ন হইতে পারে না। আমরা খাদ্যরূপে যাহা আহার করিয়া থাকি, তাহাই আমাদের শরীরটিকে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। শরীরের মধ্যে যে সকল যন্ত্র আছে, তাহারা স্ব স্ব কার্য্য সাধন করিয়া যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখনই তাহাদিগের ক্লান্তি দূর করিবার জন্য যে প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহাই ক্ষুধা-তৃষ্ণারূপে আমাদের দেহে প্রকাশ পায়। খাদ্যের প্রয়োজন এই জন্যই; ফল কথা, যথোপযুক্ত পুষ্টিকর দ্রব্যসকল খাদ্যরূপে গ্রহণ না করিলে, মানবের দেহযন্ত্র বিকল হইয়া পড়ে, শারীরিক শক্তিহীনতা এবং স্বাস্থ্যভঙ্গ তাহারই ফলসম্ভূত।

পাশ্চাত্য-স্বাস্থ্য-তত্ত্ববিদের কথা

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, যে সকল দ্রব্য অক্সিজেন কর্ত্তৃক দগ্ধ হইয়া শরীরের পুষ্টিসাধন করে এবং শারীরিক সামর্থ্য আনিয়া দেয়,

তাহার নাম খাদ্য। তাঁহাদের মতে, খাদ্য গ্রহণ করার পরে উহার অর্গানিক পদার্থ নিশ্বাস বায়ুর অক্সিজেন দ্বারা যে সময় দগ্ধ হইয়া যায় সেই সময় শরীরে তাপ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ তাপই শারীরিক ক্রিয়া সকল সাধন করিবার উপায়স্বরূপ। জাহাজ এবং রেলগাড়ী প্রভৃতি তাপ-সাহায্যে যেরূপ চলচ্ছক্তি পাইয়া থাকে, খাদ্য গ্রহণের পর উহা হইতে মানবদেহে উৎপন্ন তাপও সেইরূপ গতিসংসাধক।

শারীরিক ক্ষয়ের কারণঃ—আমরা প্রত্যেক কার্য্যেই শারীরিক ক্ষয় করিতেছি। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, চিন্তা দ্বারা মস্তিষ্কের কতকগুলি স্নায়ুজীবকোষ ধ্বংস বা নিস্তেজ হইতে পারে। পদবিক্ষেপের ফলে, মাংসপেশীর গ্রন্থি সকলের কতকগুলি জীবকোষ ধ্বংস হইয়া থাকে। চর্ব্বণের ফলে খানিকটা লালা যাহা নিঃসৃত হইল—তাহার দ্বারা কতকগুলি জীবকোষের ধ্বংস হইয়া থাকে। এইরূপে সর্ব্বদাই আমাদের শারীরিক অপচয় ঘটিতেছে। এই ক্ষতি পূরণ করিবার জন্যই খাদ্যের প্রয়োজন। নানাকারণে সর্ব্বদাই আমাদের দেহ হইতে কতকগুলি জীবকোষ যেমন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে, সেইরূপ উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণের ফলে নূতন জীবকোষ পুরাতনের স্থানগুলিও পূর্ণ করিতেছে—কাজেই আমরা শরীরের কোন অংশের যে ক্ষতি হইতেছে—তাহা মনে করিতে পারি না। এক কথায় শারীরিক ক্ষতি পূরণ—খাদ্যভিন্ন কোনক্রমেই সম্ভব নহে।

কিরূপ খাদ্যের প্রয়োজন?—কিন্তু যা' তা' কতকগুলি দ্রব্য ভক্ষণ করিলেই শারীরিক ক্ষতিপূরণের সম্ভাবনা নাই। প্রাণীমাত্রেরই দেহ নানাপ্রকার ধাতব, উপধাতব ও জৈবিক পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত। আমরা যাহা আহার করি, তাহা মুখ-মধ্যস্থ লালারসের সাহায্যে ক্রমে ক্রমে পাকস্থলী, যকৃৎ এবং অন্ত্রের বিবিধ রস দ্বারা পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত শরীরে পরিভ্রমণ করে এবং কিয়দংশ রক্তের সহিত মিলিত

হয়। শরীরমধ্যস্থ জীবকোষগুলি (animal cells) ঐ রক্ত হইতে নিজ নিজ প্রয়োজনানুরূপ পদার্থ গ্রহণ করিয়া লয় এবং যে সকল জীবাণু মরিয়া গিয়াছে বা অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে, সে গুলিকে বাহির করিয়া দেয়। কাজেই মৃত বা অকার্য্যকর জীবকোষের স্থলে নূতন জীবকোষের পরিপুষ্টির জন্য উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করা একান্তই কর্ত্তব্য। উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ না করিয়া, যদি যা' তা' খাইয়া উদরপূর্ত্তি করা যায়, তাহা হইলে তাহার ফলে কখনই ক্ষয়ের পরিপোষণ হইতে পারে না। মনে রাখিতে হইবে, একমাত্র তাপ-উৎপাদন ও ক্ষয়নিবারণ করা ব্যতিরেকে খাদ্যের উদ্দেশ্য—বল-উৎপাদন এবং দেহের বৃদ্ধিসাধন। এইজন্যই খাদ্য-বিচার আবশ্যক।

খাদ্য সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা ঃ—সাধারণে মনে করেন, অধিক খাইলেই বুঝি শরীরের পুষ্টিসাধন হইল। কেহ বা মনে করেন, মাছ মাংস অধিক খাইলে শারীরিক পুষ্টিসাধন অবশ্যম্ভাবী। কাহারও কাহারও ধারণা, শাকসব্জী খাইলে শারীরিক উন্নতিলাভের কোন সম্ভাবনাই নাই—ঐগুলি একেবারেই অসার, শরীরপুষ্টির কোন উপাদানই উহাতে নাই। এসকল কিন্তু অতিশয় ভ্রান্ত ধারণা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের শরীরমধ্যস্থ কর্ম্মনিরত যন্ত্রসকল যখন অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখনই খাদ্যের প্রয়োজন। মনে রাখিতে হইবে, যদি যন্ত্রসকল অবসন্ন না হইয়া থাকে, তাহা হইলে যদি সে সময় খাদ্য গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে শারীরিক পুষ্টিলাভের পরিবর্ত্তে, শারীরিক ক্ষতিই হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন মাংসই হউক, মাছই হউক, দুগ্ধই হউক, ঘৃতই হউক—যে জাতীয় শারীরিক ক্ষতি হইতেছে, সেই জাতীয় দ্রব্যের দ্বারা তাহা পূর্ণ করিতে হইবে। তা' ছাড়া, যে শাকসব্জীর কথা বলা হইল, সেগুলিও আমাদের শারীরিক পুষ্টিসাধনের বিশেষ সহায়ক না হইলেও, কতকটা যে সাহায্য করিয়া থাকে, তাহা নিশ্চিত। আসল কথা, কতকগুলি

গুরুপাক দ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে ভোজন করিলেই শরীরের উন্নতি হয় না ; স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে, দেহধারণের উপযোগী খাদ্য নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানবদেহের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

মানবদেহের পদার্থ সমূহ ঃ—পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—আমাদের দৈহিক যন্ত্র সকল অনবরত নিজ নিজ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখনই পরিপুষ্টির জন্য খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজন। এ অবস্থায় আমাদের দেহের ভিতরকার সংবাদ জানাও একটু আবশ্যক। দেহতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, আমাদের দেহে প্রতি শত অংশে অম্লজান (Oxygen) ৭২, অঙ্গার (Carbon) ১০॥০, উদ্‌জান (Hydrogen) ৯, যবক্ষারজান্ (Nitrogen) ৪॥০, ক্যালসিয়ম ১·৩ এবং ফস্ফরাস্ ১·১ ভাগ আছে। ইহা ভিন্ন গন্ধক, লৌহ, সোডিয়ম্, পটাসিয়ম্, ক্লোরিণ, ম্যাগনেসিয়ম্ ও সিলিকণও কিছু কিছু আছে।

মূল পদার্থ।—কিন্তু এতগুলি পদার্থ শরীরের মধ্যে পৃথক ভাবে থাকে না, কেবলমাত্র সামান্য পরিমাণে অম্লজান, উদ্‌জান ও যবক্ষারজান—রক্ত ও অন্ত্রের মধ্যে নিহিত থাকে। বাকী পদার্থগুলি পরস্পরের মিশ্রণ সাহায্যে Proximate বা আদিমিশ্র নামক পদার্থ উৎপন্ন করে, ইহাদের দ্বারাই শরীর নির্ম্মিত হয়। এই "আদি মিশ্র" পদার্থ[illegible]লিক

আবার তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা হয়—১ম যবক্ষারজানবিশিষ্ট পদার্থ সমূহ (Nitrogenous Proximate), ২য় যবক্ষারজানশূন্য জৈবিক অন্তিম পদার্থ সমূহ (Non-nitrogen) এবং ধাতব ও উপধাতব পদার্থ সমূহ (Mineral)।

(১) যবক্ষারজান পদার্থ ঃ—এই যবক্ষারজানবিশিষ্ট পদার্থ সমূহের মধ্যে অঙ্গার, অম্লজান, উদ্‌জান এবং যবক্ষারজান নামক কয়েকটি পদার্থ আছে। গন্ধক ও ফস্‌ফরাসও বিদ্যমান থাকে। এই যবক্ষারজানবিশিষ্ট পদার্থ সমূহের মধ্যে (ক) এলবুমেন (Albumen) (খ) মাইওসিন (Myosin) (গ) ফাইব্রিণ (Fibrin) (ঘ) গ্লোবুলিন (Globulin) (ঙ) কেজিন (Caseine) (চ) মিউসিন (Meucine) (ছ) জেলাটিন (Gelatine) (জ) ফারমেণ্টস্ (Ferments) (ঝ) বর্ণপ্রদায়ক ও সেরিব্রিণ (Cerebrine) নামক কয়েকটি প্রধান। উহারা আমাদের দেহে বহুভাবে বিস্তৃত। এই পদার্থগুলির মধ্যে এলবুমেন—মনুষ্য দেহের রক্ত ও অন্যান্য দৈহিক রসে নিহিত এবং ডিম্বের শ্বেত অংশের মত বর্ণবিশিষ্ট। মাইওসিন—মানব দেহের মাংসপেশীর রস। ফাইব্রিণ—রক্তের ঘনকারক পদার্থ। গ্লোবুলিন—মানব দেহের রক্ত ও অন্যান্য স্থানেও পাওয়া যায়। কেজিন—দুগ্ধের ছানার মত পদার্থ। মিউসিন—শ্লৈষ্মিক পদার্থ। জেলাটিন—অস্থি ও গ্রন্থি সকলকে উত্তাপ দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া উৎপন্ন হয়। ফারমেণ্ট—পাচকরস সকলের সারাংশ। বর্ণ প্রদায়ক—রক্ত, পিত্ত, মূত্র ও ঘর্ম্ম সকলের বর্ণকারক। সেরিব্রিণ—স্নায়ুমণ্ডলের প্রধান উপাদান।

(২) যবক্ষারজান শূন্য আদিমিশ্র পদার্থ সমূহ ঃ—ইহাদের উপাদান তিনটি,—অঙ্গার, অম্লজান এবং উদ্‌জান্। এই তিনটির মিশ্রণে ইহারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। শরীরের প্রায় সকল স্থানেই

তৈলময় পদার্থ বর্ত্তমান। যবক্ষারজানশূন্য আদিমিশ্র পদার্থ সমূহে অঙ্গারের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী এবং অম্লজানের পরিমাণ খুবই কম। কিন্তু ইহা শরীরের মধ্যে থাকিয়া অম্লজানের সহিত মিলিত হইলে শরীরে উত্তাপ উৎপন্ন করে এবং তাহার ফলে শৈত্য দূর হয়। গ্লাইকোজেন অর্থাৎ এক প্রকার শ্বেতসার পদার্থও এই উপাদানগুলিতে আছে; শরীরের যে স্থানে খুব দ্রুত কার্য্য চলিতেছে, সেই স্থলে উহা পাওয়া যায়। উদ্ভিদ হইতে উৎপন্ন এবং স্তনদুগ্ধ হইতে উৎপন্ন দুই প্রকার শর্করা এবং অম্লরস সমূহও এই পদার্থ গুলিতে পাওয়া যায়।

(৩) ধাতব ও উপধাতব পদার্থ ঃ—মানবদেহে ধাতব এবং উপধাতব পদার্থের সংখ্যাই অধিক। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে —জল শরীরের সকল স্থলেই পাওয়া যায়, এমন কি, অতিশয় কঠিন যন্ত্র—অস্থি এবং দন্তও জলশূন্য নহে। ইহা ভিন্ন সোডিয়ম্ ও পটাসিয়ম্ ক্লোরাইড্ শরীরের অনেক স্থানেই পাওয়া যায়। মানব দেহের অস্থির প্রধান উপাদান, ক্যালসিয়ম্ ফস্ফেট্। লৌহও অম্লজানের সহিত পাওয়া যায়।

মূল ভৌতিক পদার্থগুলির ক্ষয় ও পরিপূরণ ঃ—এখন সহজেই বুঝা যাইবে যে, আমাদের শরীর কতকগুলি ভৌতিক পদার্থ দ্বারা গঠিত; ঐ ভৌতিক পদার্থগুলির ক্ষয়ের পরিপূরণের জন্য ঐ জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন। সেই জন্যই পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কতকগুলি যা'তা' খাদ্য গ্রহণ করিলেই শারীরিক উন্নতি লাভের সম্ভাবনা নাই। আমরা দেহতত্ত্ব সংক্ষেপভাবে বুঝাইতে গিয়া যে আদিমিশ্র পদার্থের বিশ্লেষণ করিয়াছি, ঐ আদিমিশ্র পদার্থগুলির যখন যেটির ক্ষয় হয়, তজ্জাতীয় খাদ্য গ্রহণের ফলে তাহার পরিপোষণ হইয়া থাকে। স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বলিয়া গিয়াছেন, সুস্থদেহ ব্যক্তি প্রত্যহ ৩০৭ গ্রেণ নাইট্রোজেন এবং ৪৭০০ গ্রেণ কার্ব্বন শরীর হইতে বাহির করিয়া ফেলে। —অতএব, সেই

নাইট্রোজেন ও কার্ব্বণ প্রত্যহ এত অধিক পরিমাণে বাহির হইয়া যাওয়াতে, উহার পুনঃপুষ্টির জন্য ঐ জাতীয় খাদ্যই আমাদিগের প্রত্যহ খাওয়া প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মনে না রাখিয়া, যাঁহারা অন্যরূপ খাদ্য গ্রহণ করেন, তাঁহাদের স্বাস্থ্য কখনই সমুন্নত হইতে পারে না।

তৃতীয় অধ্যায়

শরীর ধারণের জন্য কিরূপ খাদ্যের প্রয়োজন?

শরীর রক্ষার উপযোগী খাদ্য :—মানবদেহ যেরূপ পদার্থ দ্বারা গঠিত, তাহা বিচার করিয়া পণ্ডিতগণ নিম্নলিখিত পদার্থ সমন্বিত খাদ্যগুলি প্রত্যহ ভোজন করা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন :—

১ম। প্রোটিন্ বা আমিষ জাতীয়

২য়। ফ্যাট বা স্নেহ জাতীয়

৩য়। কার্ব্বোহাইড্রেটস্ বা শালিজাতীয় (শ্বেতসার ও শর্করা)

৪র্থ। লবণজাতীয়

৫ম। জল

আমিষ জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা।—আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ না করিলে শরীরের পুষ্টি সাধিত হয় না এবং দহনক্রিয়ারও ব্যত্যয় ঘটে। ইহার অভাবে শারীরিক তাপ উৎপাদনেও বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। পূর্ব্বে মানবদেহের ভৌতিক পদার্থগুলি বুঝাইবার সময় আমরা যে যবক্ষারজানময় ভৌতিক পদার্থের পরিচয় প্রদান করিয়াছি—আমিষজাতীয় খাদ্য তাহারই অন্তর্গত। যবক্ষারজানময় খাদ্য—এলবুমেনস্

পদার্থপূর্ণ। বৈজ্ঞানিক ডাক্তারগণ বলেন,—এরূপ খাদ্য গ্রহণের ফলে (১) দেহের শক্তি বা তেজ প্রকাশিত হয় (২) শারীরিক রস সমূহও এই যবক্ষারজানময় খাদ্য গ্রহণের ফল (৩) যান্ত্রিকক্রিয়া পরিচালনার ইহা প্রধান সহায় (৪) যদি যবক্ষারজানময় খাদ্য পরিত্যাগ করা যায়, তাহা হইলে যান্ত্রিক ক্রিয়াও বন্ধ হইয়া যায়। যবক্ষারজানময় খাদ্যের দ্বারা—শরীরের মেদ, মাংস ও স্নায়ু প্রভৃতির যে সকল ক্ষয় হইয়া থাকে, তাহার পূরণ ও পুনর্নির্ম্মাণ ঘটিয়া থাকে। কোন কোন বৈজ্ঞানিক বলেন, শ্বেতসার বা তৈলাক্ত খাদ্য গ্রহণ শরীর ধারণের পক্ষে উপযোগী হইলেও, যবক্ষারজানের সহায়তা পাইয়াই ঐ সকল খাদ্য হইতে তেজ উৎপন্ন হয়। ঐ তেজ দ্বারাই পেশী ও স্নায়ুমণ্ডলীর কার্য্য হইয়া থাকে এবং উহাই উত্তাপরূপে পরিণত হয়। যবক্ষারজানময় খাদ্যের অন্তর্গত প্রোটিন্ খাদ্য গ্রহণ না করিলে, দেহ-তন্তু (Tissue) এবং রস সমূহেরও গঠন ও ক্ষতিপূরণ হইতে পারে না। বায়ু হইতে অক্সিজেন অংশ গ্রহণেরও অভাব হয়। এই প্রোটিড্ খাদ্যের দ্বারা কোন কোন স্থলে চর্ব্বির গঠন এবং শক্তির (Energy) বিকাশ হইয়া থাকে। মৎস্য, মাংস, ছানা, দাল প্রভৃতি খাদ্য হইতে এই আমিষ উপাদান পাওয়া যায়:

ফ্যাট্ বা স্নেহজাতীয় খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা :—এই জাতীয় খাদ্যের দ্বারা—চর্ব্বি প্রস্তুত হয় এবং ইহা হইতে তেজ ও শক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। স্নায়ুমণ্ডলীর পুষ্টিসাধনও ইহাতেই হইয়া থাকে। এই জাতীয় খাদ্যের অভাব হইলে শিশুদিগের রিকেটস্ নামক পীড়া হইতে পারে। মৎস্য ও মাংসের চর্ব্বি, ঘৃত তৈল প্রভৃতি এই জাতীয় খাদ্য।

কার্ব্বোহাইড্রেটস্ বা শালি জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা।—এই খাদ্যগ্রহণের ফলেও চর্ব্বি প্রস্তুত হয় এবং শারীরিক উত্তাপ ও তেজ

জন্মিয়া থাকে। আমরা যে চাউল, গম, আলু, চিনি, এরারুট প্রভৃতি খাইয়া থাকি, তাহারা এই জাতীয় খাদ্য।

লবণ জাতীয় খাদ্যের আবশ্যকতা ঃ—এই জাতীয় খাদ্যের অভাবে 'স্কার্ভি' নামক রোগ উপস্থিত হইতে পারে। মুখনিঃসৃত লালা ও পাকস্থলীনিঃসৃত রসের পরিপাক করিবার ক্রিয়া, এই জাতীয় খাদ্যের উপরে নির্ভর করিতেছে। অস্থিগঠন ও পরিপাক কার্য্যের সুবিধার জন্য হাইড্রোক্লোরিক এ্সিড্ উৎপাদন, শরীরের পুষ্টিসাধন এবং শক্তির পরিচালন—এই খাদ্য গ্রহণ না করিলে হইতে পারে না। আমরা যে লবণ খাইয়া থাকি, তাহা ভিন্ন—শাকসব্জি ও ফল মূলের মধ্যস্থ ফসফেট্ অব লাইম পটাস্, সোডা ও মাংসস্থিত গন্ধক প্রভৃতি এই জাতীয়।

জলের আবশ্যকতা ঃ—জলের অভাবে পরিপাক ক্রিয়া এবং পোষণ কার্য্য সম্যক্‌রূপে সাধিত হইতে পারে না, মাংসপেশী সকল এবং স্নায়ুমণ্ডলী তেজোহীন হইয়া পড়ে, শরীর শুকাইয়া যায় এবং ক্লান্ত হইয়া পড়ে। জল গ্রহণের ফলে রক্ত তরল থাকে। জল গ্রহণ না করিলে রক্ত গাঢ় হওয়ায়, শরীরমধ্যস্থ দূষিত পদার্থ সকল বাহির হইতে পারে না, কাজেই নানারূপ রোগগ্রস্ত হইতে হয়। জল গ্রহণের ফলে, ঘর্ম্ম ও মূত্রাদিরূপে শরীরের ক্ষয়প্রাপ্ত ও দূষিত অংশ সমস্ত বাহির হইয়া যায়। আমরা যে জল পান করিয়া থাকি, তাহা ভিন্ন সকল খাদ্যেই অল্পবিস্তর পরিমাণে জল মিশ্রিত থাকে।

ভাইটামিন বা খাদ্য প্রাণ ঃ—উপরে খাদ্যের যে সকল উপাদানের কথা বলা হইল. তদ্ভিন্ন শরীর রক্ষার জন্য আরও কয়েক জাতীয় উপাদান নিতান্ত প্রয়োজন। সে উপাদানগুলি জীবনীশক্তিবর্দ্ধক ও রোগনিবারক। সেগুলিকে 'ভাইটামিন' বা খাদ্যপ্রাণ" বলে। মৎস্য, পক্ষীর ডিম্ব, এবং দুগ্ধ, অঙ্কুরিত ছোলা প্রভৃতিতে এই ভাইটামিন্

যথেষ্ট আছে। বিজ্ঞানবিদ্‌পণ্ডিতগণ বলেন,—ভাইটামিনের অভাব ঘটিলে বেরিবেরি, স্কার্ভি এবং রিকেট্‌স্ নামক পীড়া উৎপন্ন হইতে পারে। রন্ধনের সময় আমাদের অনেক খাদ্য হইতেই ভাইটামিন্ নষ্ট হইয়া যায়। চাউল ছাঁটিয়া লওয়ার জন্যও উহা হইতে এই ভাইটামিন্ নষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহাদের মতে মাজা পরিষ্কার ধব্‌ধবে চাউল অপেক্ষা, মোটা আমাজা চাউলে ভাইটামিন্ অধিক থাকায়, উহা শরীর পুষ্টির বেশী সাহায্যকারী। ভাইটামিন্ সম্বন্ধে পরে আলোচিত হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য খাদ্য

চাউল।—আমরা যে সকল খাদ্য খাইয়া জীবন ধারণ করি, তাহার মধ্যে চাউলই সর্ব্বপ্রধান। শুধু বাঙ্গালা দেশের কথা নহে, পৃথিবীর প্রায় তাবৎপ্রদেশের অধিবাসিগণই অল্পাধিক পরিমাণে চাউল ব্যবহার করিয়া থাকেন। বাঙ্গালীর পক্ষে ত ইহা জীবনস্বরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এই চাউল বাঙ্গালা দেশের নানাস্থানে জন্মিয়া নানাপ্রকার নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে পাটনাই, বালাম, দেশী, বাঁকতুলসী, বোম্বাই দাদখানি, চিনিশক্কর, ব্রহ্মদেশীয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু বালাম অপেক্ষা দেশী চাউলের অন্ন খাইতে সুস্বাদু বলিয়া আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকেই দেশী চাউলের অধিক পক্ষপাতী; বোম্বাই প্রদেশের এবং পূর্ব্ববঙ্গের উৎপন্ন চাউল অন্যান্য স্থানের উৎপন্ন চাউল অপেক্ষা অধিক সারবান্।

নূতন ও পুরাতন চাউল।—নূতন চাউল অপেক্ষা পুরাতন চাউল সহজপাচ্য এবং অধিক পুষ্টিকর। অন্ততঃ ছয়মাসের পুরাতন না হইলে, সেই চাউল ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। নূতন চাউল গুরুপাক, এজন্য নূতন চাউল উঠিলে, উহা খাইয়া আমাদের দেশের বহুসংখ্যক লোক এই সময়ে উদরাময়ে ভুগিয়া থাকে।

ভাতের ফেন।—সাধারণতঃ আমরা ভাতের ফেন গালিয়া অন্ন খাইয়া থাকি। উহাতে অন্নের সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যায় না। কারণ একসের চাউল সিদ্ধ করিলে প্রায় তিন সের মাড় জন্মে। এই তিন সের মাড়ে দুই ছটাকের অধিক শ্বেতসার বাহির হইয়া যায়। এই শ্বেতসারের মধ্যে যবক্ষারজানেরও অংশ আছে, ফেন গালিলে তাহারও পরিমাণের হ্রাস হয়। কোন্ সময় হইতে কাহার কর্ত্তৃক যে ভাতের ফেন গালিবার এই অনিষ্টকর প্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত হইয়াছে, তাহার তথ্য নির্ণয় করা দুরূহ। আমাদের দেশের গরীব লোকদের মধ্যে শুধু ফেন খাইবার প্রথাও প্রচলিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়; তাহারা আমাদের অপেক্ষা শক্তিশালী ও বলিষ্ঠ। ভাতের ফেন গালিয়া খাওয়ায় আমরা যেরূপ অন্ন গ্রহণের সম্যক্ ফলে বঞ্চিত আছি, সেইরূপ উহার ফলে আমরা অর্থেরও অপচয় করিতেছি বলিতে পারা যায়। ছোট ছেলেদের পোরের ভাত দিবার প্রথা এখনও আমাদের দেশ হইতে লুপ্ত হয় নাই, এই পোরের ভাত প্রস্তুত করিতে হইলে ফেন গালিতে হয় না এবং পোরের ভাত যাহাদিগকে খাওয়ান হয়, তাহারা উহার ফলে যথেষ্ট বল সঞ্চয় করিয়া থাকে। এখন পোরের ভাতের মত অন্ন প্রস্তুত করিবার জন্য নানাবিধ 'কুকারের' যে প্রচলন আছে, উহাতে ফেন গালিতে হয় না। ফল কথা, এখন আমরা যে ভাবে ফেন গালিয়া ভাত খাইয়া থাকি, তাহার জন্য আমরা ভাতের ফল যতটা পাওয়া উচিত, তাহা [illegible] হই না।

সিদ্ধ ও আতপ চাউল।—সিদ্ধ চাউল অপেক্ষা আতপ চাউল অধিক পুষ্টিকর। সিদ্ধ চাউল প্রস্তুতের সময় বেশী করিয়া ছাঁটিলে উহাতে লবণজাতীয় পদার্থ ও ভাইটামিন অত্যন্ত কম থাকিয়া যায়। কাজেই উহা বেশী পুষ্টিকর তো হয়ই না, তদ্ভিন্ন বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করিয়াছেন, এরূপ চাউলে প্রস্তুত অন্ন গ্রহণের ফলে 'বেরিবেরি' রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। আমাদের দেশে সিদ্ধ চাউলের অধিক প্রচলন, কিন্তু বাঙ্গালার বাহিরে সিদ্ধ চাউলের আদৌ প্রচলন নাই সেই জন্য বাঙ্গালী অপেক্ষা সকল স্থানের অধিবাসিগণই অধিক শক্তিশালী। বাঙ্গালার বিধবাদিগের অধিকাংশই সিদ্ধ চাউল না খাইয়া আতপান্ন গ্রহণ করিয়া থাকেন, এজন্য তাঁহারা পুরুষ অপেক্ষা অনেকটা সুস্থদেহ ও নীরোগ থাকেন। ফল কথা, ভাতের ফেন গালিয়া যেমন খাওয়া উচিত নহে, সেইরূপ অন্যান্য দেশের মত সিদ্ধ চাউলের পরিবর্ত্তে আতপ চাউলের অন্ন গ্রহণ করা আমাদের কর্ত্তব্য। এসম্বন্ধে অনেক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বহু আলোচনা করিয়াছেন, তথাপি যে কেন এই অনিষ্টকর প্রথা আমাদের দেশ হইতে উঠিয়া যায় না, বলিতে পারি না।

চাউল হইতে প্রস্তুত নানা প্রকার খাদ্য।—চাউল হইতে শুধু ভাত নহে মুড়ি, চিড়া প্রভৃতি নানা প্রকার খাদ্যই প্রস্তুত হইয়া থাকে। এগুলি ভাতের অপেক্ষা বেশী সারবান, তাহার কারণ ভাতের মত এগুলি হইতে ফেন গালিবার আবশ্যক হয় না, সেইজন্য চাউলের সমস্ত অংশই ইহাতে থাকিয়া যায়। মুড়ি, চিড়া প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্যের পরিবর্ত্তে বার্লি বিস্কুট প্রভৃতি শিশুদিগকে খাইতে দেওয়া একদিকে যেমন অকারণ ব্যয়সাপেক্ষ, অন্যদিকে তেমনি স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর।

চাউলের মধ্যে ছানাজাতীয়, মাখনজাতীয় ও লবণজাতীয় উপাদান অল্প পরিমাণে বিদ্যমান আছে, শর্করাজাতীয় দ্রব্যের অংশই বেশী

অধিক। চাউলে শর্করাজাতীয় অংশ অধিক বলিয়াই ইহার সহিত দাল, তরকারি, মাছ এবং দুগ্ধাদি খাইবার দরকার হয়।

চাউল সম্বন্ধে ডাক্তারি কথা।—ডাক্তার বেনেট বলেন, অন্নের গুণ—ধারক। উদরাময় প্রভৃতি রোগে রোগীকে পুরাতন চাউলের অন্ন ব্যবস্থা করা উচিত। অনেক চিকিৎসকেরই মত যে, বার্লী-সাগু অপেক্ষাও ইহা অল্প সময়ের মধ্যে পরিপাক প্রাপ্ত হয়। ডাক্তারেরা বলেন, ডেক্ষ্ট্রীন্ (Dextrine) এবং সেলিউলোজ (Cellulose) নামক অপাচ্য পদার্থ চাউলে ২·১ পরিমাণ থাকে।

চাউলের প্রকার ভেদে উপাদানের বিশ্লেষণ।—এখনকার পণ্ডিতগণ চাউলের প্রকারভেদ করিয়া উহাতে যে সকল উপাদান আছে, তাহার যেরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

দাল।—চাউলের পরই দালের কথা বলিতে হয়, কারণ চাউল হইতে প্রস্তুত অন্ন গ্রহণের প্রধান উপকরণই অনেক স্থলে দাল। এক কথায়, চাউলের নীচেই বাঙ্গালীর খাদ্যের মধ্যে দালের কথা উল্লেখ করিতে পারা যায়। আমাদের দেশে যে সকল দাল অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে মুগ সর্ব্বাপেক্ষা সহজপাচ্য মসূরও মুগের ন্যায়ই সহজে জীর্ণ হইয়া থাকে। পশ্চিম বঙ্গে এবং রাঢ় দেশে কলাইয়ের দালের প্রচলন বেশী, এই কলায়ের দালে শরীরের স্থূলত্ব বৃদ্ধি করে। পশ্চিমবঙ্গে মসূর, মুগ, খেঁসারী, মাসকলাই, মটর, অড়হর প্রভৃতিই বেশী প্রচলিত, কিন্তু ইহাদের মধ্যে খেঁসারির দাল ক্রমাগত ব্যবহার করিলে লেথ্রিজম (Lathyrism) নামক একপ্রকার বাতব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে—ইহা পাশ্চাত্য চিকিৎসকদিগের মত। মসূর দালে ছানাজাতীয় উপাদান অধিক বিদ্যমান। মুগের দাল এবং ছোলার দাল অধিক সারবান। সর্ব্বাপেক্ষা মুগের দাল রোগীর সুপথ্য। পূর্ব্ববঙ্গে মসূর এবং মটরের প্রচলন বেশী।

২৪ পরগণা, কলিকাতা এবং কলিকাতার দক্ষিণাঞ্চলে অড়হর ও খেঁসারির প্রচলন বেশী। সকল প্রকার দালই পুষ্টিকর বটে, কিন্তু পুরাতন দাল ব্যবহার করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে, কারণ দালে নাইট্রোজেনাস্ পদার্থ যথেষ্ট আছে, কিন্তু টাটকা না হইলে এই অংশের প্রয়োজনীয় পরিমাণের অল্পতা ঘটিয়া থাকে।

দাল প্রস্তুতের কথা।—খুব ভাল করিয়া সিদ্ধ না করিয়া দাল আহার করা উচিত নহে। উহা এরূপভাবে সিদ্ধ করিতে হইবে যে, উহার ৯২ ভাগ সহজে পরিপাক প্রাপ্ত হয়। স্মরণ রাখা উচিত—মাছ, মাংস অপেক্ষা দাল কম পুষ্টিকর নহে। কিন্তু সুসিদ্ধ না হইলে ইহা জীর্ণ হয় না, কাজেই অনিষ্টের আশঙ্কা বেশী। মাছ, মাংস, দালে ছানা জাতীয় উপাদান অধিক, এই জন্যই নিরামিষভোজী ব্যক্তিগণ যথেষ্ট পরিমাণে দাল খাইলে, মাছ বা মাংসভোজীর অপেক্ষা কখনই সামর্থ্যহীন হইতে পারে না। যাহাই হউক, প্রত্যেক বাঙ্গালীর প্রত্যহ উপযুক্ত পরিমাণে সুসিদ্ধ দাল খাওয়া যে উচিত, তৎবিষয়ে সন্দেহ নাই।

দালের উপাদানের বিশ্লেষণ ঃ—কোন্ কোন্ দালে আমাদের দেহ পোষণের উপযোগী কি কি পরিমাণ উপাদান আছে,তাহা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

আয়ুর্ব্বেদে দালের গুণ।—আয়ুর্ব্বেদে দালের সাধারণ গুণ বলা হইয়াছে,—ইহা মধুর-কষায়রসযুক্ত, কটুবিপাক, রুক্ষ, বাতজনক, কফপিত্তনাশক, মল ও মূত্রের অবরোধক এবং শীতবীর্য্য।

মুগ।—উপরে যে দাল সম্বন্ধে সাধারণ গুণ-পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তদ্ভিন্ন শ্রেণীবিভাগে বলা হইয়াছে,—মুগ—মল সংগ্রাহক,

প্রভৃতি গুণ বিশিষ্ট, কফপিত্তকারক, অল্প বায়ুবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর ও জ্বরনিবারক। শ্যাম, হরিত, পীত, শ্বেত ও রক্তবর্ণ ভেদে নানা প্রকার মুগ আছে, তন্মধ্যে সুশ্রুত বলেন, হরিদ্বর্ণ মুগই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

মাষকলাই।—স্নিগ্ধ, রুচিকারক, বায়ুনাশক, তৃপ্তিকর, বলকারক মলমূত্রনিঃসারক, মেদোজনক, পিত্তবর্দ্ধক এবং ইহা অর্শবলি, অর্দ্দিতশ্বাস ও পরিণাম শূল নাশক।

মটর।— মলসংগ্রাহক, লঘু, বাতকর এবং ইহা কফ, পিত্ত, রক্তদোষ প্রভৃতি নিবারক।

অড়হর।—লঘু, মলসংগ্রাহক, বায়ুজনক, বর্ণপ্রসাদক এবং পিত্ত, কফ ও রক্তদুষ্টি নাশক।

ছোলা।—ইহা লঘু কিন্তু বাতজনক। ইহা পিত্ত, রক্তদোষ ও কফ নাশক।

খেঁসারি।—ইহা অতীব রুক্ষ, কফপিত্ত নাশক, রুচিকারক, মলসংগ্রাহক।

দালের প্রকার ভেদে অন্য দ্রব্য।—দাল যেরূপ ভাবে সাধারণতঃ রন্ধন করা হয়, তদ্ভিন্ন ধোকা, বড়ী, পাঁপর, কচুরী ডালপুরী, পিঠা, সরুচাকলি এবং বেশমের প্রস্তুত নানাপ্রকার সামগ্রী প্রস্তুত হইয়া থাকে। মুগের লাড়ু, জিলাপি, বোঁদে, দরবেশ, মিঠাই প্রভৃতিও প্রস্তুত হইয়া থাকে। এ সকল খাদ্য অতিশয় রুচিকারক, অথচ এ গুলির দ্বারা দাল ভক্ষণের কার্য্যও সিদ্ধ হইয়া থাকে।

খিচুড়ি।—চাউল ও দাল মিশাইয়া যে খিচুড়ি প্রস্তুত করা হয়—তাহাও অতিশয় পুষ্টিকর। এই খিচুড়ি প্রস্তুত করিলে চাউলের সারভাগ আদৌ নষ্ট হয় না বলিয়া ইহা বলবর্দ্ধনের কার্য্য বেশী করিয়া

থাকে। তবে খিচুড়ি অধিক মসলা এবং ঘৃত দিয়া প্রস্তুত করিলে গুরুপাক হয় বলিয়া, অনেকে বলেন, ইহার প্রচলন বেশী হওয়া কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু ইহা ঠিক নহে, খিচুড়ি প্রস্তুত করিবার সময় বেশী মসলা এবং ঘৃত না দিয়া প্রস্তুত করিলে উহা কখনই দুষ্পাচ্য হয় না এবং শরীর পুষ্টির বেশী সাহায্য করিয়া থাকে। ভাতের ফেন ফেলিয়া দেওয়ায় চাউলের সারভাগ নষ্ট হইয়া যায়, এজন্য আমাদের শরীর পুষ্টির সম্পূর্ণ সাহায্য করে না, কিন্তু খিচুড়িতে সারভাগ নষ্ট হয় না বলিয়া ইহা শরীর পুষ্টির বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে—ইহা সকলেই মনে রাখিয়া, খিচুড়ির প্রচলন বেশী করা উচিত। আয়ুর্ব্বেদে খিচুড়ির নাম কৃশরা। এই কৃশরা সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

কৃশরা শুক্রলা বল্যা গুরুঃ পিত্তকফপ্রদা।
দুর্জ্জরা বুদ্ধিবিষ্টম্ভী মলমূত্রকরী স্মৃতা॥

বলকারক, গুরুপাক, পিত্ত-কফ বর্দ্ধক, দুষ্পাচ্য, বুদ্ধিপ্রদ ও মলমূত্র প্রবর্ত্তক।

গম বা গোধূম।—বাঙ্গলা দেশে যেমন চাউলের প্রচলন অত্যধিক, উত্তরপশ্চিম প্রদেশ এবং শুধু উত্তর পশ্চিম প্রদেশ কেন, পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ স্থানেই সেইরূপ গোধূমের প্রচলন অধিক। এই গোধূম হইতে আটা এবং ময়দা প্রস্তুত হয়। পৃথিবীর তাবৎ প্রদেশেই ইহার সমাদর বেশী। সহরের বাঙ্গালীরাও ইহা একবেলা ব্যবহার করিয়া থাকেন। একবেলা ভাতের পরিবর্ত্তে আটা ব্যবহার করাই সমীচীন।

গোধূমের প্রকার ভেদ।—"দুধে" "গঙ্গাজলি" ও "জামালি" এই তিন প্রকার গোধূমের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। এই তিন প্রকার গোধূম হইতে যে ময়দা প্রস্তুত হয়, তাহার মধ্যে "দুধে" ও

"গঙ্গাজলি" হইতে প্রস্তুত ময়দার বর্ণ শ্বেত এবং "জামালি" হইতে প্রস্তুত ময়দা কিঞ্চিৎ মলিন।

আটা ও সুজি ঃ—গোধূম হইতে আটা এবং সুজিও প্রস্তুত হইয়া থাকে। ময়দা এবং আটা অপেক্ষা সুজি সহজে জীর্ণ হয়, এই জন্য রোগীদিগের পথ্যে অনেক স্থলে সুজির ব্যবস্থা করা হয়। ইহা ময়দা বা আটা অপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর। ইহার কারণ, সুজিতে আমিষ বা ছানাজাতীয় পদার্থ অধিক পরিমাণে বিদ্যমান। ময়দা ও আটার মধ্যে ভূষি থাকায় উহা দ্বারা কোষ্ঠশুদ্ধি হয়, কিন্তু যাঁতায় ভাঙ্গা আটায় কলের ময়দা অপেক্ষা আমিষ, স্নেহ এবং লবণ জাতীয় উপাদান বেশী, এজন্য ময়দা অপেক্ষা ইহা বলকর। ময়দা অপেক্ষা আটার প্রচলন অধিক হইলে দেশের মঙ্গল।

ময়দায় ভেজাল ঃ—খাদ্য যেমন আমাদের শরীরপুষ্টির সাহায্য করিয়া থাকে, সেইরূপ খাদ্যে যদি ভেজাল থাকে, তাহা হইলে তদ্দ্বারা শারীরিক উন্নতি অপেক্ষা শারীরিক ক্ষতির সম্ভাবনাই অধিক। অন্যান্য দ্রব্যের মত ময়দাতেও যথেষ্ট ভেজাল চলিয়া থাকে। চাউলের গুঁড়া ময়দার সর্ব্বপ্রধান ভেজাল। চাউলের দর যদি সস্তা থাকে এবং গমের দর বেশী হয়, তাহা হইলে অনেক দুষ্ট ব্যবসায়ী ময়দার সহিত চাউলের গুঁড়া মিশাইয়া থাকে, তদ্ভিন্ন ফট্‌কিরির গুঁড়া ইহার সহিত মিশান হয়। ফট্‌কিরির গুঁড়া মিশাইলে ময়দা ধব্‌ধবে সাদা হইয়া থাকে, এজন্য অনেক ক্রেতা মনে করেন, এই ময়দা অতি উত্তম, কিন্তু এইরূপ ভেজাল ময়দা ব্যবহার করিলে অজীর্ণ, অম্ল, এবং আমাশয় রোগকে ডাকিয়া আনা হয়। শুনিয়াছি, একপ্রকার পাথরের গুঁড়া নাকি আজকাল ময়দার সহিত দুষ্ট ব্যবসায়ীরা মিশাইয়া থাকে। আমাদের দেশ যে এত অজীর্ণপ্রবণ, বোধ হয় তাহার কারণ ইহাই!

যব হইতে ময়দা ঃ—যবাদি শস্য হইতেও ময়দা প্রস্তুত হয় কিন্তু উহা ময়দার ন্যায় মুখরোচক নহে। ফলতঃ গমের ময়দার প্রচলনই অধিক এবং ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

চাউল অপেক্ষাই ময়দায় নাইট্রোজেন বেশী এবং কার্ব্বণ অল্প। যাঁতায় ভাঙ্গা আটার যে ভূষ থাকে, তাহা দুষ্পাচ্য এবং তাহার নীচের অংশ নাইট্রোজেনাস পদার্থে পূর্ণ এবং পুষ্টিজনক। বহুমূত্র বা ডায়াবিটীসের রোগীদিগকে যে যাঁতায় ভাঙ্গা আটার ব্যবস্থা দেওয়া হয়, ইহাই তাহার কারণ।

আয়ুর্ব্বেদে গোধূম ঃ—আয়ুর্ব্বেদের মতে গোধূম মধুর রসযুক্ত, বায়ু এবং পিত্তনাশক, গুরুপাক, কফজনক, শুক্রপ্রদ, বলকর, স্নিগ্ধ, ভগ্নসংযোজক, সারক, দেহের দৃঢ়তা সম্পাদক, বর্ণপ্রসাদক এবং রুচিকর প্রভৃতি গুণ বিশিষ্ট।*

গোধূম হইতে প্রস্তুত দ্রব্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণ ঃ—

গোধূম হইতে প্রস্তুত ময়দা, আটা, সুজি এবং যাঁতায় ভাঙ্গা আটায় যে সকল পদার্থ থাকে, রাসায়নিক পণ্ডিতগণ তাহার যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

রুটি ও লুচি ঃ—ময়দা ও আটা হইতে রুটি ও লুচি প্রস্তুত হয়। লুচিতে ঘৃতের পরিমাণ অধিক থাকে বলিয়া শ্বেতসার জীর্ণ করিবার জন্য যে প্রচুর লালারসের আবশ্যক, সেই রসের কার্য্য সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয় না। সাধারণ রুটিতে প্রায় ১৫ হইতে ১৮ ভাগ জল থাকে বলিয়া লুচি অপেক্ষা রুটি সহজে জীর্ণ হয়। সাধারণতঃ সিদ্ধ করিয়া ময়দা বা আটা হইতে রুটি প্রস্তুত করা হয় না, কিন্তু সিদ্ধ করিয়া হইলে উপকার

* গোধূমো মধুরঃ শীতো বাতপিত্তহরো গুরুঃ।
কফশুক্রপ্রদো বল্যঃ স্নিগ্ধঃ সন্ধানকৃৎ সরঃ॥

বেশী। যদি সিদ্ধ করিয়া না লওয়া হয়, তাহা হইলে ময়দা বা আটা মাখিয়া এবং বেশ করিয়া ঠেসিয়া একটি তাল করিয়া যদি অন্ততঃ ৬।৭ ঘণ্টা কাল রাখিয়া দেওয়া যায় এবং তাহার পরে ঐ তালটিকে আবার বেশ করিয়া ঠেসিয়া রুটি প্রস্তুত করিয়া সেঁকিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে উহা অতি সহজপাচ্য হইয়া থাকে। যাঁহাদের পক্ষে রুটি হজম করিতে কষ্ট হয়, তাঁহারা এই প্রথা অবলম্বন করিলে অধিক উপকার পাইবেন।

পাঁউরুটি ঃ—পাঁউরুটির অধিক আদর পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে। আমাদের দেশেও ইহার আদর এখন খুব বাড়িয়া উঠিয়াছে। এই পাঁউরুটি ব্যবহার করিবার সময় আগুনে সেঁকিয়া লওয়া উচিত। ইহা সহজপাচ্য। আজকাল সাদা ময়দার পরিষ্কার পাঁউরুটির পরিবর্ত্তে লাল আটার পাঁউরুটিও কোথাও কোথাও পাওয়া যাইতেছে। বলা বাহুল্য, শেষোক্ত প্রকারই খাদ্যহিসাবে বেশী মূল্যবান্।

সুজির রুটি ঃ—পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—সিদ্ধ করা আটার রুটি সহজ-পাচ্য। সাধারণতঃ ময়দা বা আটা সিদ্ধ করিয়া রুটি প্রস্তুত করার প্রথা বড় একটা দেখা যায় না, কিন্তু সুজির রুটি প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে জলে সিদ্ধ করিয়া তাহার পরে রুটি প্রস্তুত করা হয়,—এই জন্যই সুজির রুটি সহজে জীর্ণ হইয়া থাকে। যাহাদের পক্ষে ময়দা বা আটার রুটি ভালরূপ জীর্ণ হয় না, তাঁহাদের পক্ষে সুজির রুটি ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

বার্লি ঃ—বার্লি বলিয়া যে দ্রব্য অধুনা আমাদের দেশে সর্ব্বাধিকভাবে প্রচলিত হইয়াছে, ইহা যব হইতে প্রস্তুত। যবের ছাতু আমাদের দেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের মতে ইহা মেধাজনক, অগ্নিবর্দ্ধক ও বলকারক প্রভৃতি গুণ বিশিষ্ট। বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন, ভাত অপেক্ষা ইহাতে নাইট্রোজেন এবং দুষ্পাচ্য পদার্থ

অধিক। সাধারণতঃ বার্লি যেভাবে প্রস্তুত করা হয়, তদ্ভিন্ন বার্লি হইতে রুটিও প্রস্তুত হইতে পারে, তবে ইহা ময়দার ন্যায় খাইতে সেরূপ মুখরোচক নহে।

পঞ্চম অধ্যায়

দুগ্ধ

দুগ্ধকে আয়ুর্ব্বেদে অমৃত বা পয়ঃ বলা হইয়াছে; বাস্তবিক ইহা অমৃতস্বরূপ। মাতৃজঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে, এই দুগ্ধ দ্বারাই শিশুর জীবন ধারণ হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদ এই জন্য ইহার আর একটি নাম দিয়াছেন "বালজীবন"। ঘৃত, ছানা, মাখন, ক্ষীর দধি, ঘোল প্রভৃতি আমরা যত প্রকার পুষ্টিকর খাদ্য খাইয়া থাকি— তাহার সকলগুলিই দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এক কথায়, দুগ্ধে সকল জাতীয় খাদ্যই বর্ত্তমান থাকায় শরীর-পুষ্টির পক্ষে ইহা যে বিশেষ সহায়ক, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই।

দুগ্ধ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মত:—দুগ্ধের এত গুণ থাকা সত্ত্বেও, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, শিশু ব্যতিরেকে, বয়স্কদিগের পক্ষে কেবলমাত্র দুগ্ধদ্বারা শরীরের পোষণকার্য্য সম্পূর্ণ হইতে পারে না; কারণ, প্রাপ্তবয়স্কদিগের পক্ষে শরীরসাধনের জন্য খাদ্যসমূহে যে যে উপাদান যে যে অনুপাতে থাকা প্রয়োজন, দুগ্ধে তাহার সমস্ত নাই। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বলেন, প্রাপ্তবয়স্কদিগের পক্ষে কেবলমাত্র দুগ্ধ পান করিলে, দশ ভাগ জলের সহিত পরিত্যক্ত হয় এবং নব্বই ভাগ

শরীরে শোষিত হইয়া থাকে। আর যদি কেবলমাত্র দুগ্ধ পান না করিয়া অন্য খাদ্যের সহিত ইহা সেবন করা যায়, তাহা হইলে সহজে পরিপাক হয় এবং ইহার অধিক পরিমাণ সারভাগই শরীরে শোষিত হইয়া থাকে। প্রকৃত প্রথা, দুগ্ধ—বালক, যুবা, বৃদ্ধ সকলের পক্ষেই হিতকর, কিন্তু শিশুদিগের পক্ষেই কেবল মাত্র দুগ্ধ পান করিয়া বর্দ্ধন ও পোষণ কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে পারে।

দুগ্ধের প্রকার ভেদ :—আয়ুর্ব্বেদে নানাপ্রকার দুগ্ধের গুণাগুণ লিখিত আছে। তন্মধ্যে গব্যদুগ্ধ, ছাগীদুগ্ধ, মেষীদুগ্ধ, মহিষী দুগ্ধ এবং গর্দ্দভীর দুগ্ধের প্রচলনই দেখিতে পাওয়া যায়। স্তনদুগ্ধ শিশুদিগের পক্ষে অমৃততুল্য। গর্দ্দভীর দুগ্ধ স্তনদুগ্ধের অভাবে উত্তম কার্য্য করে। অবশিষ্ট দুগ্ধগুলিও শরীরপোষণের বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে। শিশুদিগের পক্ষে স্তনদুগ্ধের অভাব হইলে, কেবল গর্দ্দভীর দুগ্ধ কেন, গব্যদুগ্ধ এবং ছাগীর দুগ্ধও হিতকর। কিন্তু ঐ সকল দুগ্ধ ব্যবহার করিবার সময় কেবল মাত্র দুগ্ধ সিদ্ধ না করিয়া, দুগ্ধ যতটা ততটা জল মিশাইয়া সিদ্ধ করিয়া, একটু মিছরি মিশাইয়া, পান করান হিতকর। শিশু যদি ৬ মাসের বা তদূর্দ্ধ বয়সের হয়, তাহা হইলে অর্দ্ধেক জল ও অর্দ্ধেক দুধ না লইয়া দুধের সহিত সামান্য পরিমাণে জল মিশাইয়া লওয়া কর্ত্তব্য।

দুগ্ধে ভেজাল :—খাঁটি দুধ এখন একরূপ দুর্লভ হইয়াছে। গোয়ালারা দুধে যেরূপ জল ঢালিয়া থাকে, তাহাতে দুগ্ধ পানের উপকারিতা তো দূরের কথা, অনেক স্থলে ঐ জল দূষিত থাকায়, দুধ পানের ফলে শরীরে নানাপ্রকার রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। মাখন তোলা দুধ এবং বাছুর মরিয়া গেলে ফুকা দিয়া যে দুধ দোহন করিয়া লওয়া হয়, তাহা বিশেষ অনিষ্টকারী। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত-দিগের মতে বিশুদ্ধ গাভীর দুগ্ধের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১·০২৬ হইতে

১'০৩৫। এক সেরের গাভীর দুধে মোটামুটি আড়াই কাঁচ্চা ছানা, ৩ কাঁচ্চা চিনি, ২॥০ কাঁচ্চা মাখন এবং ॥০ কাঁচা লবণ জাতীয় পদার্থ থাকে। মহিষীর দুধে গাভীর দুধ অপেক্ষা দ্বিগুণ পরিমাণ মাখন থাকে, এজন্য ইহা গুরুপাক। কিন্তু খাইতে গাভীর দুধ অপেক্ষা সুমিষ্ট। আয়ুর্ব্বেদ বলেন, ছাগী দুগ্ধ সর্ব্বরোগনাশক এবং পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা বলেন ছাগীদুগ্ধ গোদুগ্ধেরই মত উপকারী। মহিষী দুগ্ধের প্রচলনও আমাদের দেশে অত্যধিক। এই দুগ্ধ—গব্যদুগ্ধ অপেক্ষা স্নিগ্ধ, ক্ষুধাবর্দ্ধক এবং নিদ্রাজনক কিন্তু গুরুপাক। আয়ুর্ব্বেদ বলেন, মহিষী দুগ্ধ পানে ক্ষুধা কম হইয়া থাকে।

কিরূপ দুগ্ধ পান করা উচিত?—আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে দুগ্ধকে অমৃত বলিয়া উল্লেখ থাকিলেও, প্রসবের পরে দশ দিনের মধ্যে গব্যদুগ্ধ, ছাগীদুগ্ধ প্রভৃতি পান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। গর্ভবতী গাভীর দুগ্ধও পান করা নিষিদ্ধ। গাভীর বাঁটে যদি ক্ষত থাকে কিম্বা যে গাভীর বাঁট হইতে দুগ্ধ আপনা-আপনি ক্ষরিত হইতে থাকে অথবা যে গাভীর দুইটি বাছুর হইয়াছে, তাহাদের দুগ্ধও শাস্ত্রমতে অপেয়। সদ্য দোহন করা দুগ্ধ পরম বলকারক এবং বায়ু, পিত্ত ও কফ—ত্রিদোষনাশক। এইরূপ দুগ্ধকে ধারোষ্ণ দুগ্ধ বলা হয়। এই ধারোষ্ণ দুগ্ধ—গাভীরই প্রশস্ত, কিন্তু মহিষীর ধারোষ্ণ দুগ্ধ উপকারী নহে, মহিষীর দুগ্ধ শীতল হইলে উপকারী হয়। ভেড়ার দুধ জ্বাল দেওয়ার পর শীতল না হওয়া পর্য্যন্ত উপকারী। ছাগী দুগ্ধ শীতল হইলে উপকার হয়, জ্বাল দেওয়া দুধ গরম অবস্থায় পান করিলে কফ ও বায়ু এবং শীতল করিয়া পান করিলে পিত্ত নষ্ট হয়। অর্দ্ধেক জল অর্দ্ধেক দুধ একত্র পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ নামাইয়া পান করিলে তাহা অত্যন্ত লঘু হয়। নির্জ্জলা দুধ যত অধিক পাক করা যায়, ততই স্নিগ্ধবীর্য্য ও বলবর্দ্ধক হয়।

ভেজাল হইতে আত্মরক্ষার উপায়।—এখনকার দিনে যেরূপ ভেজাল চলিয়াছে, তাহাতে বাজারের দুগ্ধ জ্বাল দিয়াই পান করা উচিত। গোজাতির এক প্রকার পীড়া আছে, তাহার নাম Foot and mouth disease (ফুট এণ্ড মাউথ ডিজিজ)। দুগ্ধ দ্বারা পীড়া মানব শরীরে সংক্রামিত হইতে পারে, এজন্য দুগ্ধ জ্বাল দিয়া পান করিলে দুগ্ধের দোষ কাটিয়া যায়। বাজারের দুগ্ধ আনিয়া, বা গোয়ালাবা দিয়া যাওয়ার পর বেশীক্ষণ ফেলিয়া রাখিয়াও জ্বাল দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, কারণ বায়ু সংস্পর্শে নানাপ্রকার বিষ—দুগ্ধে প্রবেশ করিতে পারে।

দধি।—সাধারণতঃ গাভীর দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত এবং মহিষীর দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত—এই দুই প্রকার দধিই আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি। শাস্ত্র সকলপ্রকার দধিকেই অগ্নিদীপক, স্নিগ্ধ এবং গুরু বলিয়াছেন। গাভীর দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত দধির পুষ্টিকারিতা শক্তি এবং অগ্নিদীপন-শক্তি খুব বেশী। গাভীর দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত দধি—বায়ুনাশক, মহিষীর দুগ্ধে প্রস্তুত দধি কফকারক ও বায়ুপিত্তনাশক। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা বলেন,—দধি যে পরিপাক ক্রিয়ার বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে, তাহার কারণ, দধির মধ্যে ল্যাক্‌টিক বা অম্লরস আছে। এখনকার বৈজ্ঞানিকেরা আরও বলেন,—আমাদের অন্ত্রমধ্যস্থ যে সকল অনিষ্টকারী জীবাণু বর্ত্তমান আছে, দধির ল্যাকটিক্ এসিড-বীজাণুদ্বারা তাহা নষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহাদের মতে যাঁহারা প্রত্যহ দধি ব্যবহার করেন—তাঁহারা নীরোগ ও সুস্থ দেহে দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারেন। কিন্তু শ্লেষ্মা-প্রধান লোকের পক্ষে বেশী পরিমাণ দধি সেবন কর্ত্তব্য নহে। গুরুপাক দ্রব্যাদি আহারের পরে দধি খাওয়া উচিত, তাহাতে পরিপাক-ক্রিয়ার সাহায্য হইয়া থাকে। সদ্যঃপ্রস্তুত দধি বিশেষ ফলপ্রদ হয় না।

ঘোল।—অতি উপাদেয় দ্রব্য। আয়ুর্ব্বেদের মতে এই ঘোল বা তক্র—অমৃতসদৃশ। আয়ুর্ব্বেদ বলিয়াছেন,—

"ন তক্রসেবী ব্যথতে কদাচিন্ন তক্রদগ্ধাঃ প্রভবন্তি রোগাঃ।
যথা সুরাণাংমমৃতং সুখায় তথা নরাণাং ভুবি তক্রমাহুঃ" ॥

অর্থাৎ—তক্র-সেবনকারী ব্যক্তিকে কোন ক্লেশ অনুভব করিতে হয় না এবং তক্রসেবন করিলে কোন রোগগ্রস্তও হইতে হয় না। পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, যেমন অমৃতপান দেবতাগণের সুখাবহ, তক্রপানও মনুষ্যদিগের পক্ষে তদ্রূপ সুখপ্রদ হয়।

তক্রের শ্রেণীবিভাগ।—আয়ুর্ব্বেদে তক্রকে ঘোল, মথিত, তক্র উদশ্বিৎ ও ছচ্ছিকা এই পাঁচভাগে বিভাগ করা হইয়াছে। সরের সহিত নির্জ্জলা দধি মন্থন করিলে তাহাকে ঘোল বলে। সরবিহীন দধি—জলের সহিত মন্থন করিলে তাহাকে মথিত বলে। চারিভাগ জলের সহিত দধি মন্থন করিলে তাহাকে তক্র এবং অর্দ্ধাংশ জলের সহিত দধি মন্থন করিলে তাহাকে উদশ্বিৎ ও বহু পরিমাণে জল মিশ্রিত করিয়া মন্থন করিলে যে স্বচ্ছ পদার্থ থাকে, তাহাকে ছচ্ছিকা বলা হয়। উহাদের মধ্যে চিনিসংযুক্ত ঘোল পরম উপকারক। ঘোল—বায়ু ও পিত্ত নাশক। মথিত—কফ ও পিত্ত নাশক। তক্র—ধারক, লঘু, অগ্নিদীপ্তিকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও পিত্তজনক এবং বায়ুনাশক। গ্রহণী প্রভৃতি রোগীর পক্ষে ইহা বিশেষ হিতকর। উদশ্বিৎ—কফবর্দ্ধক, বলকারক, অত্যন্ত শ্রান্তিনাশক। ছচ্ছিকা—বায়ু ও পিত্ত প্রশমক কিন্তু কফকারক।

ছানা—ছানায় যবক্ষারজানের ভাগ বেশী, এ জন্য মিষ্ট দ্রব্যের সহিত ছানা মিশাইলে সহজে পরিপাক হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বলেন, মাংসের আমিষভাগ হইতেও ইহা বেশী বলকারক। শুধু তাহাই নহে, তাঁহাদের মতে—মাংসের মধ্যে যে সকল অনিষ্টকারক পদার্থ থাকে, ছানায় তাহা থাকে না।

মাখন।—সদ্যঃপ্রস্তুত মাখনই অধিক উপকারী। আয়ুর্ব্বেদের

মতে ইহা মেধাজনক, লঘু, ধারক প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট। মাখন—মহিষী—দুগ্ধ হইতে এবং গাভীর দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। উভয় প্রকার মাখনই সহজপাচ্য অথচ ইহা অতিশয় পুষ্টিকর, কিন্তু পচা মাখন কখনই ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে, ইহা অতিশয় অনিষ্টকারী। এখনকার দিনে যে অম্ল, অজীর্ণ বা ডিস্‌পেপ্‌সিয়া রোগে আমাদের দেশ বিশেষ-ভাবে আক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে, ইহার অন্য কারণ, বাজারের পচা মাখন সেবন, একথা আমরা বলিতে পারি। পচা মাখন খাইলে শরীরে গিয়া বিষক্রিয়া করিয়া থাকে। মাখনেও যথেষ্ট ভেজাল চলিতেছে—জল মিশান দধির সারভাগ, আলু এবং শূকরের চর্ব্বি এখন অনেক স্থলে মাখনে ভেজাল দেওয়া হয়। এ জন্য বিশেষ সাবধানতাসহ ইহা ক্রয় করা কর্ত্তব্য।

ঘৃত।—সকল প্রকার পুষ্টিকর খাদ্যের মধ্যে ঘৃতের তুলনা নাই। শাস্ত্র—ঘৃতকে রসায়ন, বায়ু-হিতকারক, দীপক, ধাতুবর্দ্ধক, তেজস্কর, লাবণ্যবর্দ্ধক, বুদ্ধিজনক, স্বরবর্দ্ধক, স্মৃতিকারক, মেধাজনক, আয়ুস্কর বলবর্দ্ধক, কফনাশক প্রভৃতি গুণসমন্বিত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আর্য্যঋষি ঘৃতের এতাদৃশ শক্তি অবগত হইয়াই বলিয়াছিলেন,—"ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।"—অর্থাৎ ঋণ করিয়াও ঘৃত খাইও। এখন এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলকারক দ্রব্য বা বিশুদ্ধ ঘৃত দেশে দুর্লভ হইয়াছে, আমাদের দৈহিক অবস্থাও তাহারই ফলে দিন দিন শোচনীয় হইতে শোচনীয়তর হইয়া পড়িতেছে।

ঘৃতের প্রধান গুণ—বিষ নষ্ট করা। ঘৃতে অঙ্গারময় পদার্থের ভাগ অধিক। বিশুদ্ধ ঘৃতে জলের ভাগ মোটেই নাই এবং যবক্ষারজানময় পদার্থ একেবারেই নাই। গব্য ও মহিষ—দুই প্রকার ঘৃত আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি। উভয় প্রকার ঘৃতই শরীরপুষ্টির সহায়তা করিয়া থাকে বটে, কিন্তু গব্যঘৃত—মহিষ ঘৃত অপেক্ষা অনেক বেশী

উপকারী। সামর্থ্যানুযায়ী সকলের পক্ষেই এই পরম উপকারী ঘৃত প্রত্যহ অল্পাধিক পরিমাণে সেবন করা কর্ত্তব্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আমিষ খাদ্য

আমিষখাদ্য মৎস্য ও মাংস ভেদে দুই প্রকার—কিন্তু আমাদের দেশে মাংস অপেক্ষা মৎস্যের প্রচলনই বেশী। পাশ্চাত্য দেশের অধিবাসীবৃন্দ অধিক পরিমাণে মাংসাশী। আমাদের দেশের লোকেরা যে মাংস ভোজন করেন না, এমন নহে,—তবে অধিকাংশ লোকের পক্ষেই মাংস ভক্ষণ প্রতিদিন না ঘটিয়া মধ্যে মধ্যে ঘটিয়া থাকে। মাংসের পরিবর্ত্তে সাধারণ বাঙ্গালী মৎস্য প্রত্যহ ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু নানা কারণে তাহাও উপযুক্ত পরিমাণে অনেকেই গ্রহণ করিতে পারেন না। এরূপাবস্থায় বাঙ্গালীর পক্ষে অন্যান্য প্রোটিড্ জাতীয় খাদ্য যথা, দাল প্রভৃতি দ্বারা এ অভাব পূরণের চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

মৎস্য।—মৎস্য সাধারণতঃ পুষ্টিকারক, বলকারক, স্নিগ্ধ, কিন্তু মৎস্য ভক্ষণে কফ ও পিত্তের প্রকোপ হইয়া থাকে। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—ব্যায়ামশীল, পথশ্রান্ত এবং বায়ুপ্রধান ব্যক্তির পক্ষে মৎস্য বিশেষ হিতকর। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র আরও বলেন,—মৎস্যাশী মানব বাতরোগে আক্রান্ত হয় না। নানাপ্রকার মৎস্য আছে, নিম্নে কয়েকটির গুণাগুণ দেওয়া যাইতেছে :—

রোহিৎ।—ইহা বাতঘ্ন।—বাতব্যাধিতে এবং চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি পীড়ায় হিতকর।

কাতলা।—আমাদের দেশে ইহা কাৎলা নামে অভিহিত। ইহা ত্রিদোষনাশক।

মৃদ্‌গিল।—আমাদের দেশে ইহার নাম—মিরগেল। ইহার গুণ রোহিত মৎস্যের অনুরূপ।

বোয়াল।—বলবর্দ্ধক, কিন্তু কফজনক। অধিক পরিমাণে বোয়াল মাছ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে, অধিক পরিমাণে সেবন করিলে রক্ত ও পিত্ত দূষিত হয় এবং কুষ্ঠরোগ পর্য্যন্ত হইতে পারে।

শিঙ্গী।—বায়ু শান্তিকর, স্নিগ্ধ কিন্তু শ্লেষ্মার প্রকোপক।

ইলিশ।—অতিশয় মুখরোচক, অগ্নিবর্দ্ধক, বায়ু এবং পিত্তনাশক কিন্তু বলপ্রদ।

ভেট্‌কী।—খাইতে অতিশয় রুচিপ্রদ, পিত্তনাশক কিন্তু ইহা বেশী খাইলে আমবাত এবং শ্লেষ্মার প্রকোপ হইয়া থাকে।

সিলন।—আসাম অঞ্চলে ইহার নাম পুঙ্গা। ইহা বলবর্দ্ধক, বায়ুবর্দ্ধক, বায়ুপিত্ত নাশক কিন্তু শ্লেষ্মাকর ও আমবাত উপস্থিত করিয়া থাকে।

কই।—রুচিকর, কফ প্রশমক, বায়ুনাশক এবং আগ্নেয়, কিন্তু কিঞ্চিৎ পিত্তকর।

বাইন।—ইহা রক্তপিত্ত নাশক।

আড়।—বায়ু এবং কফ প্রকোপক।

মাগুর।—স্নিগ্ধ এবং মল সংগ্রাহক।

টেংরা।—কফনাশক, লঘু, অগ্নিদীপক এবং পিত্ত নাশক।

পুঁটি।—কফ এবং বায়ু নাশক কণ্ঠগত রোগ নাশক এবং লঘু। এই পুঁটি মাছ দুই প্রকার। যেগুলি বড়—সেগুলির আয়ুর্ব্বেদীয় নাম বৃহৎ শফরী, চলিত নাম সরল পুঁটি। ইহা মুখগত এবং কণ্ঠগত রোগ সকল দূর করিয়া থাকে।

ভেলে।—বলকারক, কিন্তু শ্লেষ্মাবর্দ্ধক।

চিতল।—বলপ্রদ।

বেলে।—বায়ুরোগে হিতকর, অগ্নিদীপক, বলবর্দ্ধক, লঘু ও মলসংগ্রাহক।

কালবোস্।—পুষ্টিকারক, কিন্তু বায়ুবর্দ্ধক।

শোল।—রক্তপিত্তনাশক।

চিঙ্গড়ী।—বলবর্দ্ধক. রুচিকর, মেদ, পিত্ত ও রক্তদোষ নাশক কিন্তু কফ-বাত বর্দ্ধক।

চাঁদা।—বলবর্দ্ধক।

খয়রা।—বাতপিত্ত নাশক, বলবর্দ্ধক কিন্তু শ্লেষ্মাকারক।

মৌরলা।—বায়ুনাশক কিন্তু শ্লেষ্মাকারক।

ফলুই।—বলকারক।

খলিশা।—বায়ু, পিত্ত কফ, শূল ও আমবিনাশক এবং বলকারক।

পাব্দা।—বায়ুনাশক ও বলকারক।

বাচা।—বায়ু পিত্ত-নাশক কিন্তু শ্লেষ্মাকর।

পাঁকাল।—শ্লেষ্মা প্রকোপক এবং অজীর্ণকারক।

মাছের ডিম।—পুষ্টিকারক, বলবর্দ্ধক, কফ ও মেদোবর্দ্ধক। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা বলেন,—মাছের ডিমে অধিক পরিমাণে 'নিউক্লিন' থাকে বলিয়া ইহা বাতগ্রস্ত লোকের পক্ষে উপযোগী নহে, নতুবা ইহা অতিশয় সারবান খাদ্য।

মৎস্য বেশী সারবান কিনা ?—পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, —মৎস্যে ফস্‌ফরাস্‌ ঘটিত লবণ বেশী পরিমাণে থাকে, এজন্য যাঁহারা অধিক পরিমাণে মস্তিষ্ক চালনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদেব পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী।

মৎস্যের প্রকার ভেদ।—সাধারণতঃ মৎস্য দুই জাতীয়, এক সাদা, অপর মৎস্যের মাংস কাটিলে লালবর্ণ দেখায়, সেইগুলি অপেক্ষা যে সকল মৎস্যের মাংস কাটিলে লালবর্ণ দেখায়। সেইগুলি খাইতে সুস্বাদু এবং অধিক পুষ্টিকর—কিন্তু সাদা রঙের মৎস্য অপেক্ষা ইহা গুরুপাক। সাদা মৎস্যের মধ্যে বাটা, পুঁটি, মৌরলা প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে এগুলি সহজপাচ্য, অল্প পুষ্টিকর, এজন্য রোগীর পথ্য। দ্বিতীয় শ্রেণীর মৎস্যের মধ্যে রুই, কাৎলা প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে এগুলি সহজপাচ্য, অল্প পুষ্টিকর, এজন্য রোগীব পথ্য। দ্বিতীয় শ্রেণীর মৎস্যের মধ্যে রুই, কাৎলা প্রভৃতির নাম উল্লেখ করিতে পারা যায়। রোগীর পক্ষে শিঙ্গী, মাগুর এবং কই বেশী উপকারী, কারণ এ সকল মৎস্যে বসার ভাগ কম। ইলিস, চিংড়ি—বিশেষতঃ গলদাচিংড়ি এবং পার্শে, ভেটকী—অতিশয় দুষ্পাচ্য, এজন্য অধিক খাওয়া উচিত নহে।

লোণামাছ ও শুষ্কমাছ।—লোণা মাছ ও শুকনা মাছ অতিশয় অপকারী ইহারা দুষ্পাচ্য এবং স্বাস্থ্যের অপচয়কারক।

মৎস্য কিরূপ ভাবে খাওয়া উচিত।—সাধারণ গৃহস্থের সংসারে মৎস্য অল্প তৈল দিয়া ভাজা হয়, কিন্তু ইহা ঠিক নহে। ছাঁকা তৈলে মৎস্য ভাজা উচিত, তাহাতে মৎস্যের সারাংশ নষ্ট হয় না। মাছ অধিকক্ষণ সিদ্ধ করাও ঠিক নহে, তাহাতে উহার ছানা জাতীয় উপাদান জমাট বাঁধিয়া পড়ে—এবং এই জন্য ইহা দুষ্পাচ্য হইয়া থাকে। মৎস্যের তরকারী করিবার পূর্ব্বে মৎস্যকে ফুটন্ত গরম জলে যদি

একবার ফেলিয়া এবং ২।৪ মিনিট পরে তুলিয়া লইয়া তরকারির সহিত মৃদু জ্বালে সিদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে উহা সহজপাচ্য হইয়া থাকে।

পক্ষী ডিম্ব।—ডিম্ব পুষ্টিকর খাদ্য, কিন্তু গুরুপাক। ইহাতে সল্‌ফার (গন্ধক) এবং ফস্‌ফরাসের পরিমাণ অধিক, এই জন্য জীর্ণ হইতে বিলম্ব ঘটে। আমাদের দেশে হংস ডিম্বেরই প্রচলন বেশী। এই ডিম্বে যথেষ্ট পরিমাণে ছানা জাতীয় ও মাখন জাতীয় উপাদান বর্ত্তমান। এজন্য ডিম প্রত্যহ খাইলে ছানা ও মাখন জাতীয় উপাদান দ্বারা শরীরের পোষণ কার্য্য উত্তমরূপ সাধিত হইতে পারে। অনেকে ডিম্ব সিদ্ধ না করিয়া কাঁচা অবস্থায় খাইয়া থাকেন, উহা খাইতে সুস্বাদু নহে, কিন্তু অধিক পুষ্টিকর। কাঁচা ডিম্ব অপেক্ষা অর্দ্ধসিদ্ধ ডিম হজম করিতে একটু বেশী সময় লাগে বটে, কিন্তু শরীর পুষ্টির পক্ষে ইহাও কম উপকারী নহে।

অনেকক্ষণ সিদ্ধ করিয়া এবং অধিক মসলা মিশাইয়া খাইলে ডিম জীর্ণ করিতে অধিক সময় লাগে। এজন্য যাহাদের হজম শক্তি কমিয়া গিয়াছে, তাহাদের পক্ষে অধিক সিদ্ধ ডিম খাইয়া অর্দ্ধ সিদ্ধ ডিম একটু গোলমরিচের গুঁড়া ও লবণসহ মিশাইয়া খাইলে বিশেষ ভাবে শরীর পুষ্টির কার্য্য করিয়া থাকে।

ডিম্ব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণের অভিমত—বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন, ডিম্বের শ্বেতবর্ণ অংশে আমিষ উপাদান এবং পীতাংশে স্নেহ উপাদান অধিক এবং জলীয় ভাগ কম ও ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে আমিষ উপাদান বর্ত্তমান। এই জন্যই ইহা পুষ্টিকর খাদ্য। ইহা শিশুদের পক্ষে বিশেষ পুষ্টিকর খাদ্য, কারণ ইহাতে যে ফস্‌ফরাস আছে—সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তদ্ভিন্ন ক্যালসিয়ম এবং লৌহ ঘটিত লবণ উপাদান থাকার জন্যই ইহা সহজে রক্তের সহিত মিশিয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদে ডিম্বের কথা।—আয়ুর্ব্বেদে ডিম্বের প্রকার ভেদের কথা নাই; কিন্তু পক্ষী ডিম্বের উল্লেখ আছে। আয়ুর্ব্বেদে লিখিত হইয়াছে,—

নাতি স্নিগ্ধানি বৃষ্যানি স্বাদুপাকরসানি চ।
বাতঘ্নান্যতিশুক্রানি গুরূণ্যণ্ডানি পক্ষিণাম্॥

সাধারণের ধারণা হংসডিম্ব অধিক খাইলে বাতরোগে আক্রান্ত হইতে হয়। ইহা ভুল ধারণা। হংস ডিম্ব অপেক্ষা কুক্কুট ডিম্ব অধিক বলকর—ইহাও অনেকের ধারণা,—ইহাও ভুল। প্রকৃতপক্ষে কুক্কুট ডিম্ব অপেক্ষা হংসডিম্বের পুষ্টিকারিতা শক্তি অনেক অধিক এবং হংস ডিম্ব ভক্ষণের ফলে বাত রোগে আক্রান্ত হইবারও কোন সম্ভাবনা নাই। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, ২০টি ডিম্ব ও একসের মাংস—একইরূপ পুষ্টিকর (ডিম বেশী সিদ্ধ হইলে বেশী আঁসটে গন্ধ হয়)।

মাংস।—আয়ুর্ব্বেদে মাংসের গুণ যথেষ্ট আছে।

মাংসং বাতহরং সর্ব্বং বৃংহণং বলপুষ্টিকৃৎ।
প্রীণনং গুরুহৃদ্যঞ্চ মধুরং রসপাকয়োঃ॥

সকল প্রকার মাংসই বায়ুনাশক, বলবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, তৃপ্তিপ্রদ গুরুপাক।

আয়ুর্ব্বেদে মাংসের প্রশংসা।—আয়ুর্ব্বেদ সকল প্রকার মাংসের পুষ্টিকারিতা শক্তি উল্লেখ করিলেও, পশুমাংস অপেক্ষা পক্ষীর মাংসের অধিক প্রশংসা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, পক্ষীমাংস পশু মাংস অপেক্ষা লঘু, এজন্য সহজপাচ্য। পারাবতের মাংস যক্ষ্মাগ্রস্ত রোগীদিগের জন্য চিকিৎসকেরা ব্যবস্থা দিয়া থাকেন, ইহা রক্তপিত্ত নাশক, বাতঘ্ন ও বীর্য্যবর্দ্ধক। কুক্কুটমাংসের গুণও আয়ুর্ব্বেদ যথেষ্ট

বলিয়া গিয়াছেন। ইহা পুষ্টিকারক, বায়ুনাশক, চক্ষুর হিতকর এবং বলকর। তবে বন্য না হইয়া গৃহপালিত হইলে হিন্দুর পক্ষে অখাদ্য।

পশুর মাংস।—পশুর মাংসের মধ্যে ছাগমাংসের প্রচলনই অধিক। আয়ুর্ব্বেদেও ইহার যথেষ্ট গুণ বর্ণিত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদে বলেন,—

ছাগমাংসং লঘু স্নিগ্ধং স্বাদুপাকং ত্রিদোষনুৎ।
নাতিশীতমদাহি স্যাৎ স্বাদু পীনসনাশনম্॥
পরং বলকরং রুচ্যং বৃংহণং বীর্য্যবর্দ্ধনম্॥

ছাগমাংস—লঘু, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষনাশক, অত্যন্ত বলকারক, রুচিপ্রদ, পুষ্টিবর্দ্ধক ও বীর্য্যকারক।

অবস্থাভেদে গুণ ভেদ।—অবস্থাভেদে এই ছাগ মাংসের নানাপ্রকার গুণ বর্ণিত আছে যথা,—

অপ্রসূতা ছাগীর মাংস অগ্নিদীপক। ইহা শুষ্ককাস, অরুচি ও শোথ রোগে হিতকর, পীনস নাশক ও অগ্নিদীপক।

কচি ছাগ মাংস।—অত্যন্ত লঘু, হৃদ্য, জ্বরহারক, সুখপ্রদ ও অত্যন্ত বলদায়ক,। **খাসী ছাগের মাংস**—কফজনক, গুরু, স্রোতঃ-শুদ্ধিকারক, বলপ্রদ, মাংসবর্দ্ধক ও বাতপিত্ত নাশক। বৃদ্ধ এবং

ব্যাধিগ্রস্ত ছাগের মাংস।—বাতজনক ও গুরু। **ছাগমুণ্ড**—চক্ষু কর্ণাদি রোগ নাশক ও রুচপ্রদ।

মেষমাংস।—আয়ুর্ব্বেদে বলেন, ইহা পুষ্টিকর কিন্তু পিত্তশ্লেষ্ম বর্দ্ধক ও গুরু। আয়ুর্ব্বেদের মতে মেষের মাংস বাসি হইলে কিছু লঘু হইয়া থাকে।

হরিণের মাংস—ইহা অগ্নিদীপক, সন্নিপাতনাশক, লঘু এবং মলমূত্রের রোধক।

খরগোসের মাংস।—ইহা লঘু, সংগ্রাহক, মধুররস, সর্ব্বথা হিতকারক, অগ্নিকারক, কফপিত্ত এবং সর্ব্বপ্রকার বায়ুবিকৃতি, জ্বর, অতিসার, শোথ, রক্তদুষ্টি ও শ্বাসরোগনাশক।

কচ্ছপ মাংস।—বলবর্দ্ধক, বায়ু ও পিত্ত নাশক।

মাংস সম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের মত।—আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, মাংসে তিন ভাগ জল ও একভাগ সার-উপাদান বর্ত্তমান। সারভাগের মধ্যে আবার আমিষ উপাদানই অধিক; শালি উপাদান একেবারেই নাই। আমিষ উপাদান অধিক থাকার জন্যই মাংসের পুষ্টিকারিতা শক্তি বেশী।

মাংস প্রস্তুতের বিধি।—মাংস সাধারণতঃ যেরূপভাবে ঘৃত ও মসলাদি সহ প্রস্তুত করা হয়—তাহাতে হজম করিতে আরও বিলম্ব ঘটে, এজন্য অল্প মসলা দিয়া মাংস সিদ্ধ করিয়া লইলে উহা অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে পরিপাক হইয়া থাকে। মাংস কখনও দুইবার পাক করা উচিত নয়, অনেকে পূর্ব্বরাত্রে রাঁধা মাংস পরদিন গরম করিয়া খাইয়া থাকেন, তাহা অনুচিত।

মাংস ভক্ষণ এদেশের উপযোগী কিনা?—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশীয় বৈজ্ঞানিকগণই মাংসের যথেষ্ট পরিমাণে গুণ-বর্ণনা করিয়া যাইলেও, মাংস আমাদের দেশের অধিবাসীদিগের পক্ষে ঠিক উপযোগী খাদ্য কি না, সে সম্বন্ধে অনেকের সন্দেহ আছে; কারণ, বাঙ্গলাদেশ সাধারণতঃ গ্রীষ্মপ্রধান, এদেশে প্রত্যহ মাংসভক্ষণ কোনক্রমেই শরীরের পক্ষে হিতকর নহে। মাংস সারবান্ হইলেও ইহা শীতপ্রধান দেশের অধিবাসীদিগের পক্ষেই সম্যক্ উপযোগী। বাঙ্গালাদেশে শীতকালে ইহা ভোজন করিলে শারীরিক স্বাস্থ্য বজায় থাকিতে পারে; অন্যান্য সময়ে উপযুক্ত পরিমাণ "প্রোটিন্" খাদ্য, যথা—দাল, ছানা ইত্যাদি গ্রহণ করা বিধেয়।

মাংসাদি-পরীক্ষা—অধিক রক্তবর্ণ মাংস অভক্ষ্য। টাট্‌কা কচি মাংস ঈষৎ রক্তবর্ণ এবং বয়স্ক পশুর মাংস ঈষৎ বেগুনী রঙের; টাট্‌কা মাংস স্থিতি-স্থাপক। টাট্‌কা মাছ শক্ত, টিপিলে আঙ্গুলের দাগ বসে না, এবং উহা দুর্গন্ধবিহীন। অর্দ্ধ সের জলে এক ছটাক লবণ মিশাইয়া, সেই জলে ছাড়িয়া দিলে যে ডিম ডুবিয়া যায়, তাহাই উত্তম।

সপ্তম অধ্যায়

শাক-সব্জী

ভাত, রুটি বা লুচি—আমরা যাহা কিছু খাইয়া থাকি, দাল এবং তরকারি তাহার উপকরণ। দালের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই অধ্যায়ে তরকারির কথা বলিব।

গোলআলু—তরকারির মধ্যে গোলআলু আমাদের প্রধান তরকারি। আলুর দম, আলুর ডাল্‌না, আলুর ঝোল, আলুর চড়চড়ি ইত্যাদি নানাভাবে আলু ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা খাইতেও বেশ মুখরোচক। গোলআলুর পুষ্টিকারিতা শক্তি যথেষ্ট আছে, কিন্তু খোসা ছাড়াইয়া উহা ব্যবহার করার ফলে, উহার বলকারিতা শক্তি কিছু কমিয়া যায়। খোসা ছাড়াইয়া সিদ্ধ করার জন্য পরিপাক করিতেও কিছু বেশী সময় লাগিয়া থাকে। প্রথমে খোসা শুদ্ধ আলু সিদ্ধ করিয়া লইয়া, তাহার পর উহার খোসা ছাড়ানো উচিত।

লালআলু।—আয়ুর্ব্বেদ বলেন,—ইহা বলকারক ও কফনাশক।

চুবড়ী আলু—অন্যান্য আলু অপেক্ষা ইহাতে শালি উপাদান কিছু কম।

পটোল।—আয়ুর্ব্বেদে ইহা অগ্নির উদ্দীপক, রক্তদোষ, জ্বর, ক্রিমি এবং বায়ু-পিত্ত-কফ—ত্রিদোষনাশক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

পটোলঃ পাচনং হৃদ্যং বৃষ্যং লঘ্বগ্নিদীপনম্।
স্নিগ্ধোষ্ণং হন্তি কাসাস্র-জ্বরদোষত্রয়াক্রমীন্॥

ইহার মূল বিরেচক এবং ডাঁটা কফ নাশক।

পল্‌তা।—পটোলের পাতা, তিক্ত কিন্তু মুখরোচক। ইহা পিত্তনাশক এবং অগ্নির উপকারী।

বেগুণ।—বেগুণের মধ্যে যেগুলি কচি, সেগুলি কফপিত্তনাশক; পাকা বেগুণ পিত্তকারক ও গুরু। বেগুণ পোড়াইয়া খাইলে শীঘ্র পরিপাক হয় বটে, কিন্তু উহা কিঞ্চিৎ পিত্তকর। ইহা কফ, মেদ, বায়ু ও আমদোষের শান্তিকারক এবং সারক। বেগুণ পোড়ায় লবণ ও তৈল মিশাইয়া খাইলে, তাহা গুরু ও স্নিগ্ধ গুণবিশিষ্ট হয়। বেগুণ খাইলে অগ্নির উদ্দীপনা জন্মিয়া থাকে।

বৃন্তাকং স্বাদু তীক্ষ্ণোষ্ণং কটুপাকমপিত্তলম্।
জ্বরবাতবলাশঘ্নং দীপনং শুক্রলং লঘু॥

মুর্গীর ডিমের ন্যায় সাদা ছোট বেগুণ অর্শ রোগে উপকারী।

কুমড়া।—কুমড়া দুই প্রকার,—বিলাতী কুমড়া ও ছাঁচি কুমড়া বা দিশি কুমড়া। বিলাতী কুমড়া অতি মুখরোচক, কিন্তু দিশি কুমড়া অপেক্ষা গুরুপাক। উভয় প্রকার কুমড়াই পুষ্টিকারক, গুরু। দিশি কুমড়া—রক্তপিত্ত নাশক। আয়ুর্ব্বেদে রক্তপিত্ত রোগে এবং

বায়ুশান্তির জন্য ইহার যথেষ্ট ব্যবহার আছে। দিশি কুমড়ার মধ্যে কচি কুমড়া পিত্তনাশক, মাঝারি কুমড়া কফকারক এবং পাকা কুমড়া মলমূত্র নিঃসারক, অগ্নিদীপক ও সর্ব্বদোষ প্রশমক।

কুষ্মাণ্ডং বৃংহণং বৃষ্যং গুরু পিত্তাস্রবাতনুৎ।
বালং পিত্তাপহং শীতং মধ্যমং কফকারকম্।
বৃদ্ধং নাতিহিমং স্বাদু সক্ষারং দীপনং লঘু।
বস্তিশুদ্ধিকরং চেতোরোগহৃৎ সর্ব্বদোষজিৎ॥

লাউ।—ইহা শ্লেষ্মা ও পিত্তনাশক, গুরু ও রুচিকর এবং ধাতু ও পুষ্টিবর্দ্ধক।

মিষ্টং তুম্বীফলং হৃদ্যং পিত্তশ্লেষ্মাপহং গুরু।
বৃষ্যং রুচিকরং প্রোক্তং ধাতুপুষ্টি-বিবর্দ্ধনম্॥

ঝিঙ্গা।—পিত্তনাশক এবং কফবাতকারক, অগ্নিদীপক, জ্বর, শ্বাস কাস ও ক্রিমি নাশক।

রাজকোশাতকী শীতা মধুরা কফবাতলা।
পিত্তঘ্নী দীপনী শ্বাস-জ্বরকাসক্রিমিপ্রণুৎ॥

শিম।—শ্লেষ্মাবর্দ্ধক এবং বায়ুপিত্ত নাশক, বলকারক, গুরু এবং বেশী পরিমাণে খাইলে দাহ হইয়া থাকে।

শিম্বিদ্বয়ঞ্চ মধুরং রসে পাকে হিমং গুরু।
বল্যং দাহকরং প্রোক্তং শ্লেষ্মলং বাতপিত্তজিৎ॥

শ্বেত শিম ও মোগলাই শিম নামে শিম ২ প্রকার। ২ প্রকার শিমই আস্বাদে ও পাকে মধুর রস, গুরু, বলকারক, দাহজনক, শ্লেষ্মাবর্দ্ধক ও বাতপিত্ত বিনাশক।

করোলা ও উচ্ছে।—এই দুইটী দ্রব্যই জ্বর ও ক্রিমিঘ্ন, পিত্ত ও

ক্ষনাশক, অগ্নিদীপক প্রভৃতি বহুগুণবিশিষ্ট। ইহারা বাতকারক হে। বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাবের সময়ে প্রত্যহ উচ্ছের বীজ খাইলে সন্তের আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে না।

কারবেল্লং হিমং ভেদি লঘু তিক্তমবাতলম ॥
জ্বরপিত্তকফাস্রঘ্নং পাণ্ডুমেহক্রিমীন্ হরেৎ ॥

করোলা ভেদক, লঘু ও তিক্ত রস বিশিষ্ট। জ্বর, পিত্ত, কফ, পাণ্ডু, মেহ, ক্রিমি ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে।

ধুঁদুল।—

মহা কোশাতকী স্নিগ্ধা রক্তপিত্তানিলাপহা।

ইহা স্নিগ্ধ এবং রক্তপিত্ত, বাতপিত্ত ও বায়ুনাশক। বলকারক ও রুচিপ্রদ। শোষ রোগীর ইহা পরম হিতকর। পটোল অপেক্ষা ইহা কিছু কম গুণবিশিষ্ট।

চিচিঙ্গে।—ইহার গুণ প্রায় পটোলেরই মত। শোষরোগীর পক্ষে অত্যন্ত হিতকর।

চিচিণ্ডো বাতপিত্তঘ্নো বল্যঃ পথ্যো রুচিপ্রদঃ।
শোষিণেহতিহিতঃ কিঞ্চিদ্‌গুণৈর্ন্যূনঃ পটোলতঃ ॥

শজিনার ডাঁটা।—

শোভাঞ্জনফলং স্বাদু কষায়ং কফপিত্তনুৎ।
শূলকুষ্ঠক্ষয়শ্বাস-গুল্মহৃদ্দীপনং পরম্ ॥

ইহা অগ্নিদীপক এবং কফ, পিত্ত, শূল, কুষ্ঠ, ক্ষয়, শ্বাস ও গুল্ম বিনাশক।

ঢেঁড়শ।—

ডিণ্ডিশো রুচিকৃদ্ ভেদী পিত্তশ্লেষ্মাপহঃ স্মৃতঃ।
সুশীতো বাতলো রুক্ষো মূত্রলশ্চাশ্মরীহরঃ ॥

ঢেঁড়শ—রুচিকর, ভেদক, পিত্তশ্লেষ্মনাশক, বাতবর্দ্ধক, মূত্রজনক ও পাথরীনাশক।

কাঁকরোল।—

কর্কোটী মলহৃৎ কুষ্ঠ-হৃল্লাসারুচিনাশিনী।
শ্বাসকাসজ্বরান্ হন্তি কটুপাকা চ দীপনী॥

কাঁকরোল—মল, কুষ্ঠ, হৃল্লাস, অরুচি, শ্বাস, কাস এবং জ্বরনাশক। ইহা অগ্নিদীপক।

ওল।—অর্শ রোগীর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী। কফ প্লীহা এবং গুল্ম রোগীর পক্ষেও ইহা বিশেষ হিতকর। রক্তপিত্ত, দদ্রু এবং কুষ্ঠ রোগীর ইহা খাওয়া উচিত নহে। সর্ব্বপ্রকার কন্দ শাকের মধ্যে ওলই শ্রেষ্ঠ।

শূরণো দীপনো রুক্ষঃ কষায়ঃ কণ্ডূকৃৎ কটুঃ।
বিষ্টম্ভী বিশদো রুচ্যঃ কফার্শঃকৃন্তনো লঘুঃ॥
বিশেষাদর্শসে পথ্যঃ প্লীহগুল্মবিনাশনঃ।
সর্ব্বেষাং কন্দশাকানাং শূরণঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে॥
দদ্রূণাং রক্তপিত্তানাং কুষ্ঠানাং ন হিতো হি সঃ।
সন্ধানযোগসম্প্রাপ্তঃ শূরণো গুণবত্তরঃ।

মানকচু।—সর্ব্বাপেক্ষা শোথ রোগীর পক্ষে ইহা পরম উপকারী।

মাণকঃ শোথহৃচ্ছীতঃ পিত্তরক্তহরো লঘুঃ।

মানকচু—শোথহর, লঘু এবং রক্তদোষনাশক।

কাঁকুড়।—

কর্কটী শীতলা রুক্ষা গ্রাহিণী মধুরা গুরুঃ।
রুচ্যা পিত্তহরা সামা পক্কা তৃষ্ণাগ্নিপিত্তকৃৎ॥

অপক্ক বড় কাঁকুড় মলসংগ্রাহক, গুরু, রুচিপ্রদ ও পিত্ত নাশক। পাকা কাঁকুড়—তৃষ্ণা, পিত্ত ও অগ্নিকারক।

মোচা।—বায়ু ও পিত্ত নাশক এবং ক্ষয় নিবারক। বহুমূত্র রোগীর পক্ষে এবং সর্ব্বপ্রকার প্রস্রাবের পীড়াক্রান্ত রোগীর পক্ষে ইহা পরম উপকারী।

থোড়।—বহুমূত্র রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী, অথচ ইহা ধাতুবর্দ্ধক।

কাঁচাকলা।—উদরাময় রোগীর পক্ষে পরম হিতকর। ইহাতে লৌহের অংশ থাকায় ধাতু-পুষ্টির সাহায্য করিয়া থাকে। যাঁহাদের কোষ্ঠবদ্ধতা বা কোষ্ঠকাঠিন্য আছে, তাঁহাদের খাওয়া উচিত নহে।

কাঁচা পেঁপে।—প্লীহা, গুল্ম, অর্শ ও অম্ল রোগীর পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী।

পারীশঃ শীতলঃ রুচ্যঃ দীপনঃ পাচনঃ সরম্।
মধুরঃ রক্তপিত্তঘ্নঃ বিশেষাদর্শসে হিতম্॥

পেঁপে—রুচিকর, অগ্নিদীপক, পাচক, সারক, মধুররস ও রক্তপিত্ত নাশক।

মূলা।—ইহা অপক্ক অবস্থায় অর্থাৎ কাঁচা খাইলে অপকারী, উহাতে ত্রিদোষের প্রকোপ হইয়া থাকে। মূলার মধ্যে ছোট জাতীয় মূলাই খাওয়া উচিত, ইহা ত্রিদোষ নষ্ট করে।

লঘুমূলং কটূষ্ণং স্যাদ্রুচ্যং লঘুচ পাচনম্॥
দোষত্রয়হরং স্বর্য্যং জ্বরশ্বাসবিনাশনম্॥

ছোট জাতীয় মূলা—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকর লঘু, পাচক ত্রিদোষনাশক ও স্বরপ্রসাদক। ইহা জ্বর ও শ্বাসাদি বিনাশক।

শাক।—শাক বাঙ্গালীর নিত্যব্যবহার্য্য খাদ্য বলিলেই চলে; সেই জন্য কয়েকটি শাকের গুণাগুণ প্রদত্ত হইল।

ন'টেশাক।—অগ্নিদীপক এবং মলমূত্রাদির প্রবর্ত্তক।

পালংশাক।—বাতজনক, শ্লেষ্মাকর, ভেদক, গুরু। ইহা রক্তপিত্ত ও বিষদোষ নাশক।

চুকাপালং।—কফ ও অত্যন্ত পিত্তকারক, কিন্তু বাতঘ্ন। ইহা বেগুনের সহিত পাক করিলে রুচিপ্রদ হয়। চিনি মিশাইয়া খাইলে অপকারী হয় না।

হিঞ্চেশাক।—শোথ, কুষ্ঠ, কফ, ও পিত্তনাশক।

সুষুনি শাক।—নিদ্রাজনক; অনিদ্রারোগে ইহার ঝোল খাইলে সুনিদ্রা হয়। ইহা অগ্নিদীপক, মেধাজনক, ও রসায়ন।

পুঁইশাক।—বায়ু ও পিত্তনাশক কিন্তু শ্লেষ্মাজনক। কণ্ঠের অহিতকর, নিদ্রাজনক, রক্তপিত্তনাশক, বলকারক, রুচিপ্রদ, পুষ্টিকর।

পুদিনা শাক।—কফ ও বায়ু নাশক, মুখের জড়তা নাশক, বমি ও অরুচি নিবারক।

শাঞ্চে শাক।—কফ ও বাত প্রশমক, প্লীহা ও অর্শরোগনাশক।

বেতো শাক।—বলকারক। প্লীহা, রক্তপিত্ত, ক্রিমি প্রভৃতিতে উপকারী।

গীমে শাক।—পাণ্ডু, জ্বর ও প্লীহারোগ নাশক। পিত্ত, কফ এবং কামলা রোগীর পক্ষেও ইহা হিতকর।

পাট শাক।—বাতপ্রকোপক, কিন্তু রক্তপিত্ত নাশক। পিত্তজ-রোগে এই পাটশাক শুকাইলে যে নালিতা হয়—তাহা ভিজাইয়া সেই জল খাইলে উপকার হইয়া থাকে।

ছোলার শাক।—ইহা দুষ্পাচ্য। ইহা পিত্ত ও দাঁতের ফুলা নিবারক।

মটর শাক।—ভেদক কিন্তু ত্রিদোষনাশক।

কলমী শাক—নিদ্রাকারক, স্নিগ্ধ, বায়ুনাশক, স্তন্যবর্দ্ধক, রক্ত শোধক। সিফিলিস রোগীর পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী।

সজিনার ফুল।—প্লীহা ও গুল্ম নিবারক। লাল সজিনার ফুল চক্ষুরোগীর হিতকর এবং রক্তপিত্তের প্রসাদক। সজিনার ফুল—রুক্ষ ও বায়ুপ্রধান ব্যক্তির এবং প্লীহা রোগীর পক্ষে হিতকর।

শাকগুলির মধ্যে কি কি উপাদান কি কি পরিমাণে আছে, তাহার রাসায়নিক বিশ্লেষণ এবং ভাইটামিনের তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

একই তরকারি প্রত্যহ না খাইয়া মধ্যে মধ্যে পরিবর্ত্তন করিয়া খাওয়া উচিত। হিন্দুশাস্ত্রে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যই ইহা বিশেষভাবে পালন করিবার কথা বলা হইয়াছে। পঞ্জিকায় যে, অমুক তিথিতে অমুক দ্রব্য খাইতে নাই লেখা থাকে, তাহা পালন করিয়া চলিলে নানাপ্রকার রোগের হস্ত হইতে অব্যাহত থাকা যায়। একই তরকারী প্রত্যহ খাইলে অরুচি জন্মিয়া থাকে, তা'ছাড়া—তিথি অনুসারে শারীরিক বলের হ্রাস-বৃদ্ধি এবং বায়ু, পিত্ত ও কফের প্রকোপ বা হ্রাস হইয়া থাকে, এই জন্য শাস্ত্র বিশেষ করিয়া উহা পালন করিবার জন্য উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। দ্রব্যেই আমাদের শরীরের উৎপত্তি, স্থিতি ও বর্দ্ধনক্রিয়া সম্পন্ন হয়, আবার দ্রব্য দ্বারাই উহার ধ্বংস সাধনও হইয়া থাকে। ইহা মনে রাখিয়া শাস্ত্র-আজ্ঞা পালন করা কর্ত্তব্য। কোন্ কোন্ দিন কোন্ কোন্ দ্রব্য আহার নিষিদ্ধ—তাহা প্রত্যেক দিন পঞ্জিকা দেখিয়া—ব্যবস্থা করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য, ইহাতে লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই।

অষ্টম অধ্যায়

ফল

সুফলা বঙ্গদেশে ঋতুভেদে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নানাবিধ ফল জন্মিয়া থাকে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, সহর ও সহরতলী অঞ্চলে দুর্ম্মূল্যতা বশতঃ অধুনা সাধারণ বাঙ্গালী যথোপযুক্ত পরিমাণে ফল খাইতে পারেন না। পক্ষান্তরে, বাজারের জঘন্য খাবারে পয়সার অপব্যয় না করিলে প্রত্যেকেই প্রকৃতিদত্ত এই অপূর্ব্ব দ্রব্যের কিছু কিছু সুযোগ গ্রহণ করিতে পারেন। কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় সহরে সাধারণতঃ অনেক ফড়িয়ার (Middlemen) হাত ফিরিয়া ফল বাজারে বিক্রয়ার্থে উপস্থিত হয়, কাজেই দামও অন্যায়রূপে বাড়িয়া যায়। পল্লীবাসী এ বিষয়ে অনেকটা স্বাধীন ; কিন্তু, অজ্ঞতা অথবা আলস্য বশতঃ তাঁহারাও এ বিষয়ে ক্রমশঃ যেন কতকটা উদাসীন হইয়া পড়িতেছেন। ফলে, ফল-বাবদ অনেকটা টাকা বাঙ্গলার বাহিরে চলিয়া যাইতেছে এবং দুর্ম্মূল্যতাবশতঃ সাধারণ বাঙ্গালী দিন দিন ফল ভক্ষণে বঞ্চিত হইতেছেন। শিক্ষিত বাঙ্গালী যতদিন না গ্রামে ফিরিয়া যাইতেছেন এবং নিত্যব্যবহার্য্য আহার্য্য বস্তু বহুল উৎপাদনে মনোযোগী হইতেছেন, ততদিন পর্য্যন্ত এ অবস্থার উন্নতি হইবে কি না, সন্দেহ।

বলা বাহুল্য, ফল শরীরের হিতকারী এবং স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। অতএব, সময়ের টাট্‌কা ফল প্রত্যেকেরই যথাসাধ্য কিছু কিছু খাওয়া উচিত। কারণ, ফলের মধ্যে লবণজাতীয় পদার্থ কিছু কিছু বিদ্যমান থাকায় ইহা কোষ্ঠ পরিষ্কার করে, সুতরাং, যাঁহারা কোষ্ঠবদ্ধতা বা কোষ্ঠ-কাঠিন্যে ভুগিয়া থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে ফল

ঔষধ তুল্য। অধিকন্তু, ফল শরীরের রক্ত পরিষ্কার করে এবং অম্ল ও লবণজাতীয় পদার্থের অল্পাধিক বিদ্যমানতা হেতু, রক্তের ক্ষারধর্ম্ম বজায় রাখে। ফল—রক্তপরিষ্কার করে বলিয়া, সাধারণতঃ সকল ফলই অল্পাধিক বর্ণপ্রসাদক। পাশ্চাত্য সৌন্দর্য্য-তত্ত্ববিদেরা (Beauty specialists) বলেন, রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে একটি কমলা লেবু খাওয়া উচিত, তাহাতে গাত্র-ত্বক্ ক্রমশঃ পরিষ্কার হয়। আমাদের শাস্ত্রকারেরাও আম, কাঁঠাল প্রভৃতি কয়েকটি ফলকে বর্ণ-প্রসাদক বলিয়া বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

অনেক সুমিষ্ট ফলের পুষ্টিকারিতা শক্তিও যথেষ্ট আছে এবং ক, খ ও গ ভাইটামিন উক্ত ফল সমূহে অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান, (ভাইটামিন অধ্যায় দেখ)। এজন্য ক্রমবর্দ্ধনশীল শিশু, ছাত্র এবং মস্তিষ্কজীবি ব্যক্তিগণের পক্ষে ফল অপরিহার্য্য। অপস্মার প্রভৃতি মানসিক ব্যাধিতে ফল (অন্ততঃ অধিকাংশ ফলই) উপকারী। সুতরাং ফল যে মস্তিষ্কের উত্তম খাদ্য (Brain Food) তাহাতে সন্দেহ নাই।

এস্থলে বলিয়া রাখা ভাল যে, শর্করাপ্রধান সুমিষ্ট ফল সমূহ সাধারণতঃ বহুমূত্ররোগীর পক্ষে অসেব্য। এবিষয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ। ক্ষেত্রবিশেষে কাঁচা ফল (যেমন পেঁপে, বেল, কচি শশা ইত্যাদি) সকলের ভক্ষ্য হইলেও, সাধারণতঃ কাঁচা ফল পরিহার করা উচিত। অন্যদিকে, অতিরিক্ত পক্ক অর্থাৎ 'মজিয়া' যাওয়া ফল খাওয়া উচিত নহে। উভয় ক্ষেত্রেই উদরাময় হওয়া সম্ভব।

আধুনিক বিজ্ঞানের মতে, বৃক্ষের ফল, ফুলও বায়ু হইতে আমাদেরই মত অক্সিজেন আহরণ করে,—তাহাদেরও শ্বাসপ্রশ্বাস আছে। ফল, ফুল আহরণ করার পরেও এই শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া কিয়ৎকাল চলিতে থাকে এবং তদবধিই ফল বা ফুল টাটকা বা তাজা থাকে। পরে যখন

উক্ত শ্বাসপ্রশ্বাস-ক্রিয়া ক্রমশঃ বন্ধ হইতে থাকে, তখন উহারা ধীরে ধীরে শুকাইয়া, পচিয়া অথবা মজিয়া যায়। টাট্‌কা ফলই স্বাস্থ্যের অনুকূল, অতএব, মজিয়া যাওয়া ফল বর্জ্জন করিতে হইবে। আমাদের দেশের নারীরা 'মজিয়া যাওয়া' ফলের বিশেষ পক্ষপাতিনী—এ বিষয়ে তাঁহাদের একটু অবহিত হওয়া উচিত।

ফল উত্তমরূপে ধৌত করিয়া আহার করা উচিত, কারণ পক্ষীবিষ্ঠা প্রভৃতি নানাপ্রকার দূষিত পদার্থ দ্বারা ফল প্রায়ই কলুষিত হয়। সর্পাদি বিষধর জীবের সংস্পর্শে ফল বিষাক্ত হওয়ায়, সেই ফল ভক্ষণে কাহারও কাহারও মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়াছে শুনা যায়। সুতরাং, কীটাদি দ্বারা দষ্ট ফল সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য। অনেকে মাত্র দষ্ট স্থানটুকু বাদ দিয়া ফলের বাকী অংশটুকু গ্রহণ করিয়া থাকেন; কিন্তু এ প্রথাও সম্পূর্ণ নিরাপদ নহে।

আমরা নিম্নে কয়েকটি প্রচলিত ফলের গুণাগুণ বর্ণনা করিলাম এবং প্রসঙ্গক্রমে কয়েকটির রোগনাশিনী শক্তির উল্লেখ করিলাম। খাদ্য প্রসঙ্গে ঔষধের অবতারণা অবান্তর হইলেও, সাধারণের উপকার দর্শিবে এই বিশ্বাসে সেগুলি দেওয়া গেল।

আম

সংস্কৃতে আমকে অমৃত ফল বলে। বাস্তবিকই অমৃতোপম এই ফলটি ভারতবর্ষের ফলবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

অবস্থাভেদে গুণ।—আমের পুষ্প বা বোল—কফ ও রুচিকারক, ধারক এবং বায়ুবর্দ্ধক। অত্যন্ত কচি আম—কষায়, অম্লরস, রুচিকারক এবং বায়ু ও পিত্ত বর্দ্ধক। কাঁচা আম একটু বড় হইলে—অম্লরস, রুক্ষ, বায়ু, পিত্ত ও কফ জনক এবং রক্তদোষক। আমের মধ্যে যেগুলি গাছপাকা, সেগুলি মধুরাম্ল রস, গুরুপাক, বায়ুনাশক এবং কিঞ্চিৎ পিত্তজনক। ডাঁসা অবস্থায় পাড়িয়া যে আম পাকান হয়, সেই আম—

অম্লরসবিহীন ও মধুররস বিশিষ্ট এবং পিত্তনাশক। পাকা আম বাসি হইলে—তাহা অতিশয় রুচিজনক হইয়া থাকে এবং উহা বলপ্রদ, বায়ু ও পিত্তনাশক এবং সারক। কাঁচা আমের ছাল ফেলিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া যে আমচুর প্রস্তুত করা হয়, তাহা অম্লমধুর, কষায় রস, ভেদক ও কফ এবং বায়ুনাশক। বেশ সুপক্ক আমের রস গালিয়া খাইলে উহা বলকারক, গুরুপাক, বায়ুনাশক, সারক, অহৃদ্য, তৃপ্তকর, অত্যন্ত পুষ্টিকর এবং কফবর্দ্ধক হইয়া থাকে। আম খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া খাইলে, তাহা রুচিকর হয় বটে, কিন্তু উহা গুরুপাক। খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটা আম—মধুর রসবিশিষ্ট, বলকর, শীতবীর্য্য এবং বায়ুনাশক।

দুগ্ধযুক্ত আম বর্ণপ্রসাদক, মধুরস কিন্তু গুরুপাক। এরূপ ভাবে আম খাইলে রুচিজনক- পুষ্টিকর এবং শারীরিক সামর্থ্য বৃদ্ধি হয় ও ইহা দ্বারা বায়ু, পিত্ত নষ্ট হইয়া থাকে। আমে "খ" ও "গ" ভাইটামিন্ বিদ্যমান।

আমসত্ত্ব—ইহা রৌদ্রে পাক করার জন্য লঘুপাকী হইয়া থাকে। ইহা তৃষ্ণা, বমি, বায়ু ও পিত্তনাশক, সারক এবং রুচিকারক। আমসত্ত্বে "ক" "খ" "গ" ভাইটামিন্ আছে।

অধিক আম্রভক্ষণের দোষ।—অধিক আম খাইলে অগ্নিমান্দ্য হইয়া থাকে। অধিক আম খাওয়ার ফলে বিষমজ্বর, রক্তদুষ্টি ও চক্ষুরোগ ও উৎপন্ন হইয়া থাকে। শাস্ত্রকার কিন্তু বলিয়াছেন,—এই নিষেধ কেবল অম্লরসযুক্ত আম সম্বন্ধে,—মধুররসযুক্ত আম সম্বন্ধে এই নিষেধ নহে—কারণ সুমিষ্ট আম ভক্ষণ চক্ষুর হিতকর।

অতিরিক্ত আমভক্ষণে অগ্নিমান্দ্য হইবার পূর্ব্বে যদি দুই তোলা শুঁঠ, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া পান করা যায়—অথবা একআনা সচল লবণ ও এক আনা জীরকের গুঁড়া

সেবন করা যায়, তাহা হইলে অগ্নিমান্দ্যের প্রতিষেধক হইয়া থাকে। আম খাইয়া কিঞ্চিৎ দুধ খাইলে আম সহজে জীর্ণ হয়।

আম্রের রোগ নাশিনী শক্তি।—এইবার আম্রের রোগনাশিনী শক্তির পরিচয় প্রদান করিব ঃ—

প্লীহায়।—সুমিষ্ট পাকা আমের রস মধুর সহিত প্রত্যহ পান করিলে প্লীহারোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। বায়ুপ্রধান প্লীহোদরেই কিন্তু ইহা বেশী কার্য্যকারী।

রক্তস্রাবে।—আমের আঁটির শাঁস গুঁড়া করিয়া নস্য লইলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া থাকে।

রক্তাতিসারে।—আমছাল ২ তোলা বেশ করিয়া বাটিয়া লইয়া আধপোয়া ছাগদুগ্ধ এবং দেড়পোয়া জলে সিদ্ধ করিয়া, দুগ্ধটুকু অবশেষে নামাইয়া, একটু চিনি দিয়া পান করিলে রক্তাতিসারে উপকার হয়।

বমনে।—(১) আম ও জামের পাতার রস এক তোলা লইয়া আধসের জলে জ্বাল দিয়া এবং আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া অল্প অল্প পরিমাণে পান করিতে দিলে, পিত্তজনিত বমন আরোগ্য হইয়া থাকে। (২) আমের আঁটির শাস দুই আনা ও একটু মধু একত্র মিশাইয়া সেবন করিলেও বমন প্রশমিত হয়।

অতিসারে।—আমের ছালের উপরের অংশটুকু চাঁচিয়া ফেলিয়া সেই ছাল দধির সহিত পেষণ করিয়া খাইলে অতিসার এবং অতিসার-জনিত উদরের বেদনা ও দাহ প্রশমিত হয়।

অতিসারের পক্কাবস্থায়।—আমের কচি পাতা এবং কয়েদবেলের শাঁস সমানভাগে লইয়া, আধতোলা মাত্রায় চাউল ধোয়া জলসহ খাইলে পক্কাতিসার আরোগ্য হয়।

মাছ খাইয়া অজীর্ণ হইলে।—অতিরিক্ত মাছ খাওয়ার জন্য অজীর্ণ হইলে, কাঁচা আম খাইলে আরোগ্য হইয়া থাকে।

মাংস ভক্ষণে অজীর্ণ হইলে।—আমের আঁটির শাঁস সেবনে মাংসভক্ষণ জনিত অজীর্ণ রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। কাঁচা আম খাইলেও মাংসভক্ষণজনিত অজীর্ণ রোগ সারিয়া থাকে।

শোথ।— আম গাছের মূলের ছাল ও শ্বেতপুনর্ণবা—প্রত্যেকটি ছয়সের এক পোয়া লইয়া, বেশ করিয়া কুটিয়া, ৬৪ সের জলে পাক করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া /৪ সের গব্যঘৃতে (এই ঘৃতকে পূর্ব্বে যথারীতি মূর্চ্ছা দিয়া লইতে হইবে) পাক করিবে। তার পর আধসের আমগাছের মূলের ছাল এবং আধসের শ্বেতপুনর্ণবা—১৬ সের জল মিশাইয়া ঐরূপে পুনরায় পাক করিয়া লইতে হইবে। এই ঘৃত শোথনাশক, গুল্ম এবং অগ্নিমান্দ্যাদির পক্ষেও হিতকর।

শিশুর মুখপাকে।—শিশুদিগের মুখের ভিতর ঘা হইলে, যে আমগাছের কাষ্ঠ সারযুক্ত হইয়াছে—তাহা, গেরিমাটি এবং রসাঞ্জন সমানভাগে লইয়া, মধুর সহিত মিশাইয়া লাগাইয়া দিলে, আরোগ্য হইয়া থাকে।

অগ্নিদগ্ধ স্থানে।— আমপাতা পোড়াইয়া—কোন স্থান আগুনে পুড়িয়া গেলে, প্রলেপ দিলে উপশমিত হইয়া থাকে।

ডায়াবিটিস বা বহুমূত্রে।—আমের কচি পাতা গুঁড়া করিয়া সেবন করাইলে, ডায়াবিটিস বা বহুমূত্রে উপকার হয়।

ক্রিমিরোগে।—আমের ছাল আধতোলা, জল আধসের, জ্বাল শেষে আধপোয়া—এই কাথ সেবনে ক্রিমিরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

চর্ম্মরোগে।—আম্র ছালের নির্য্যাস প্রস্তুত করিয়া প্রলেপ দিলে, "স্ক্যাবিশ্" নামক চর্ম্মরোগ প্রশমিত হয়।

সর্দ্দিগর্ম্মিতে।—কাঁচা আম পোড়াইয়া খাইলে সর্দ্দিগর্ম্মিতে

উপকার হয়। শুধু সর্দ্দিগর্ম্মি নহে, রৌদ্র লাগা এবং পশ্চিম প্রদেশের 'লু'—লাগারও ইহা অপূর্ব

কানের ঘায়ে।—আম গাছের সাদা সাদা চটার নাম "কাণচট্‌কা"। —এই 'কাণচট্‌কা' সরিষার তৈলের সহিত ভাজিয়া শিশুদিগের কাণের ঘায়ে লাগাইলে উহা আরোগ্য হইয়া থাকে।

ডাক্তারি মত।—ডাক্তারি মতে অতিসার এবং নাসিকা, পাকস্থলী, গর্ভাশয়, অন্ত্র এবং ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব হইলে, স্রাব নিবারণের জন্য আম ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কাঁঠাল

কাঁঠালের কাঁচা অবস্থার নাম এঁচোড়। ইহা বায়ুবর্দ্ধক। গুরুপাক, দাহজনক, কফ ও মেদোবর্দ্ধক, কিন্তু বলকারক।

পাকা কাঁঠাল স্নিগ্ধ,তৃপ্তিজনক, পুষ্টিকারক, মাংসবর্দ্ধক, বলকারক, এবং পিত্ত, বায়ু, রক্তপিত্ত, ক্ষত ও ব্রণনাশক, কিন্তু কফজনক। কাঁঠালের বীচি মধুর রস বিশিষ্ট, মূত্রনিঃসারক কিন্তু গুরু ও মলরেচক। ইহা একটি পুষ্টিকর খাদ্য। পাকা কাঁঠালে "ক" "গ" "ঘ" ভাইটামিন্ বিদ্যমান।

কাঁঠালের রোগনাশিনী শক্তি।—কাঁঠালের ভুঁতি পোড়াইয়া ক্ষার প্রস্তুত করিয়া, একটু চূণের সহিত মিশাইয়া, ফোড়ার উপরে প্রলেপ দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায়। সিদ্ধি খাইয়া নেশা হইলে কাঁঠাল পাতার রস পান করিলে নেশা ছাড়িয়া যায়।

কাঁঠালের অপকারিতা।—কাঁঠাল গুরুপাক বলিয়া অধিক পরিমাণে খাওয়া কখনই কর্ত্তব্য নহে। গুল্ম রোগী এবং মন্দাগ্নিযুক্ত রোগীর পক্ষে ইহা ভক্ষণ করা উচিত নহে। কাঁঠাল খাইয়া অজীর্ণ হইলে, কলা খাইলে জীর্ণ হইয়া থাকে।

জাম

ভাইটামিন।—জামে "খ" ও "গ" ভাইটামিন্ আছে।

জাম তিন প্রকার, বড় জাম, ছোট জাম ও গোলাপ জাম। আমাদের দেশের বড় জামই সাধারণতঃ কালোজাম নামে অভিহিত।

জামের গুণ।—বড় জাম—গুরুপাক, বাতজনক ও কফপিত্ত প্রশমক! ছোট জাম—ধারক, কফপিত্ত, রক্তদুষ্টি ও দাহনাশক গোলাপ জাম খাইতে রুচিপ্রদ, কিন্তু গুরুপাক, এজন্য অজীর্ণ রোগীর পক্ষে বিষের মত।

রোগনাশিনী শক্তি।—জামের ফল, পাতা, আঁটি এবং জামগাছের ছালে যে সকল রোগনাশিনী শক্তি আছে, তাহাদের পরিচয় নিম্নে দেওয়া যাইতেছে ;—

রক্তাতিসারে।—(১) জামের ছাল ২ তোলা, জল দেড় পোয়া ও ছাগদুগ্ধ আধ পোয়া,—একত্র সিদ্ধ করিয়া, দুগ্ধটুকু অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া, একটু চিনি মিশাইয়া পান করিলে প্রবল অতিসার আরোগ্য হয়। (২) জামের কচি পাতা—ছাগদুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া পান করিলে রক্তাতিসারে উপকার হয়।

বমন।—আমের পরিচ্ছেদে দেখ।

শিশুর পেটের পীড়ায়।—জাম ছালের রস ও ছাগীদুগ্ধ একত্র মিশাইয়া সেবন করাইলে শিশুদের অতিসারাদি সকল প্রকার পেটের পীড়া আরোগ্য হইয়া থাকে।

ক্ষতশুদ্ধিতে।—জামপাতা পিষিয়া প্রলেপ দিলে ক্ষতশুদ্ধি হইয়া থাকে।

দন্তরোগে।—দাঁতের মাড়ী হইতে রক্তস্রাব বা দাঁতের ক্ষত

হইলে ও জিহ্বা ফাটিয়া গেলে, জামছাল এবং দুরালভা—এক একটি দ্রব্য এক এক তোলা করিয়া লইয়া, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া, আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া, সেই কাথে কুলকুচা করিলে আরোগ্য হইয়া থাকে।

বহুমূত্রে।—জামের অাঁটি গুড়া করিয়া দুই আনা মাত্রায় সেবন করিলে বহুমূত্র প্রশমিত হয়।

পেঁপে

ভাইটামিন্। পেঁপেতে "ক" ভাইটামিন্ আছে এবং "খ" ভাইটামিন্ বেশী মাত্রায় আছে।

কাঁচা পেঁপের গুণ আমরা তরকারী প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছি। পাকা পেঁপে অতি উৎকৃষ্ট খাদ্য, ইহা সহজপাচ্য ফল। রক্তপিত্ত রোগে এবং অর্শরোগে ইহা বিশেষ উপকারী।

পেঁপের আটা।—পেঁপের আটা প্লীহানাশক। অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য এবং অম্লপিত্তের রোগীদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। ইহা ভিন্ন পেঁপের আটা ক্রিমিঘ্ন ও গ্রহণীরোগ নাশক। সেবনের জন্য মাত্রা পূর্ণবয়স্কের পক্ষে চা'র চামচের এক চামচ। ৭ হইতে ১০ বৎসর বয়স্কের জন্য অর্দ্ধ চামচ। ৩ বা তাহার নিম্নবয়স্কের পক্ষে 'চা'র চামচের ৼ অংশ। দদ্রুরোগে পেঁপের আটা লাগাইলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

পেপেওটীন। ইহা পেঁপের আটার অন্যতম বীর্য্যবান উপাদান, পেঁপের আটা হইতেই ইহা প্রস্তুত হয়। ডাক্তারেরা ২ হইতে ১০ গ্রেণ মাত্রায় ইহা ব্যবস্থা করেন। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা বলেন,—৭ গ্রেণ পেপেওটিন—এক পাঁইট অর্থাৎ দেড় পোয়া দুগ্ধ পরিপাক করিতে পারে। এখনকার দিনে অজীর্ণপ্রবণ বাঙ্গালীদিগকে প্রত্যহ পেঁপের আটা দুই বেলা খাইতে পরামর্শ প্রদান করি।

কলা

কলার গুণ।—পুষ্টিজনক, রুচিকারক মাংসবর্দ্ধক ও সারক, বলকারক। অধিকন্তু চর্ম্মরোগ ও রক্তপিত্ত রোগে ইহা উপকারী, কোষ্ঠ-কাঠিন্যে কলা খাইলে সহজে দাস্ত পরিষ্কার হয়।

মাণক্য, মর্ত্তমান, অমৃত ও চম্পক প্রভৃতি কদলীর নানাপ্রকার ভেদ আছে। সর্দ্দি কাসি হইলে কলা সেবন করা উচিত নহে। কলা সহজলভ্য অতি উৎকৃষ্ট ফল বলিয়া, দেবতার পূজায় ইহার প্রচলন সমধিক।

ভাইটামিন্—কলাতে "খ" ও "গ" ভাইটামিন্ আছে।

সোম রোগে।—পাকা কলার সহিত কাঁচা আমলকীর রস ও কিঞ্চিৎ চিনি ও অল্প মধু মিশাইয়া প্রত্যহ সেবন করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

নারিকেল

ভাইটামিন্।—নারিকেলে "ক" ও "গ' ভাইটামিন আছে এবং এবং "খ" ভাইটামিন্ বেশী মাত্রায় ও "ঘ" ভাইটামিন নামমাত্র আছে।

কাঁচা এবং পাকা নারিকেলের গুণ।—কোমল নারিকেল পিত্তজ্বর ও পিত্তজনিত সমস্ত রোগ নাশক। পরিণত নারিকেল—গুরু, হৃদ্য, বল ও মাংসপ্রদ।

ডাবের জল।—ডাবের জল অগ্নিদীপক, পিপাসানাশক, অম্ল, হিক্কা ও বায়ুনাশক।

ডাবের শাস।—মূত্রবর্দ্ধক ও অম্লনাশক।

পরিণাম শূলে।—একটি সুপক্ক এবং সজল নারিকেলের ভিতর সৈন্ধবলবণচূর্ণ পূর্ণকরতঃ মৃত্তিকার লেপ দিয়া ঘুঁটের আগুণে পাক করিবে এবং তাহার পর তাহার ভিতরস্থ কৃষ্ণবর্ণ শস্য দুই আনা

হইতে চারি আনা মাত্রায় গ্রহণ করিয়া একটু পিঁপুলের গুড়া মিশাইয়া সেবন করিলে, পরিণাম শূল হইতে মুক্তি পাওয়া যায়।

বেল

ভাইটামিন্। ভাইটামিন্ "ক" আছে এবং "গ" ভাইটামিন্ বেশী মাত্রায় বিদ্যমান।

বেলের কাঁচা এবং পাকা উভয়ই উপকারী। কাঁচা বেল ধারক এবং পাকা বেল সারক। কাঁচা বেল চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া উহার খোসা, বীজ ও আঠা বাদ দিয়া ইক্ষুগুড়ের সহিত সেবন করিলে অগ্নির বৃদ্ধি হয় এবং পেটের পাড়ায় বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে। যাঁহারা অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, ডিসপেপ্সিয়া রোগে পীড়িত, তাঁহাদের পক্ষে ইহা নিত্য ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

যাঁহাদের কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়না, তাঁহারা পাকা বেল খাইলে উপকার পাইবেন। অর্শরোগীর পক্ষে ইহা প্রত্যহ খাওয়া উচিত।

কয়েদ বেল।—কয়েদবেলের পক্কাবস্থাতেই ব্যবহার কর্ত্তব্য। ইহা ধারক, কণ্ঠশোধক, পিত্তনাশক, হিক্কানিবারক এবং বায়ুনাশক, কিন্তু দুষ্পাচ্য, এজন্য ইহা অধিক খাওয়া উচিত নহে।

কুল।—নারিকেল কুল, বনকুল, মেয়াকুল প্রভৃতি নানাপ্রকার কুল হইয়া থাকে। সকল প্রকার কুলই পিপাসানাশক, অগ্নিবর্দ্ধক এবং রক্তদোষ নাশক।

আনারস।—ক্রিমিনাশক, সারক, রুচিজনক, বায়ুনাশক, শ্লেষ্মা-কারক, তৃপ্তিপ্রদ। ভাইটামিন্ "ক" ও "খ" বেশী পরিমাণে এবং "গ" ভাইটামিন্ বহুল বিদ্যমান্।

পেয়ারা।—ইহা ক্রিমি, বায়ু, তৃষ্ণা, জ্বর, মূর্চ্ছা, ভ্রম, শ্রম, ও শোথ বিনাশক ও বলকারক। কিন্তু ইহার বীজ ফেলিয়া খাওয়াই উচিত, নতুবা গুরুপাক হইয়া থাকে।

কাঁকুড় ও ফুটি।—কাঁকুড় পিত্তঘ্ন, কফনাশক ও ধারক। ফুটি—পিত্তবর্দ্ধক।

তরমুজ।—অপক্ক অবস্থায় অধিক খাইতে নাই। কারণ ইহা ধারক এবং গুরু। পক্ক তরমুজ বায়ুনাশক কিন্তু পিত্তকারক।

খরমুজ।—ইহা মূত্রকারক, বায়ুনাশক বলকারক ও কোষ্ঠশোধক।

শশা।—কচিশশা—পিপাসা, ক্লান্তি, দাহ, পিত্ত ও রক্তপিত্তনাশক। পাকা শশা পিত্তবর্দ্ধক কিন্তু কফ ও বায়ুনাশক শশার বীজ মূত্রকারক, পিত্ত ও মক্তদোষ এবং মূত্রকৃচ্ছ্রতানাশক।

শশাতে "খ" ভাইটামিন্ বিদ্যমান।

আতা।—ইহা তৃপ্তিজনক, পুষ্টিকারক, রক্তবর্দ্ধক, কিন্তু শ্লেষ্মজনক। বাতপিত্ত, রক্তদুষ্টি, দাহ, তৃষ্ণা ও বমন রোগ নিবারণের জন্য ইহা খাইলে উপকার হইয়া থাকে।

তাল। —পাকা তাল পিত্তবর্দ্ধক, কফজনক, কিন্তু রক্তবর্দ্ধক। ইহা দুষ্পাচ্য, তন্দ্রাজনক এবং মূত্রজনক।

তালশাঁস।—কফবর্দ্ধক, কিন্তু বাতঘ্ন, পিত্তনাশক এবং সারক। ইহাতে "গ" ভাইটামিন্ বিদ্যমান।

করম্চা।—ইহা অপক্ক অবস্থায় পিপাসানাশক কিন্তু গুরুপাক, রক্তপিত্ত ও কফজনক। পক্ক অবস্থায়—ইহা বায়ু ও পিত্তনাশক।

লেবু।—লেবুর মধ্যে পাতিলেবু উৎকৃষ্ট। পাতি এবং কাগজীলেবু ক্রিমি ও অম্লনাশক এবং উদরব্যথা নিবারক। অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য এবং বাতরোগে ইহা অমৃততুল্য। বাতাবীলেবু—যকৃতের পক্ষে পরমোপকারী। কমলালেবু অতিশয় বলকারক। একছটাক কমলালেবুর রস একছটাক খাঁটি দুধের সমান। প্রত্যেক লেবুতেই ভাইটামিন্ যথেষ্ট পরিমাণে আছে। এরূপ অবস্থায় শিশুদিগকে

পাতিলেবুর রস সেবন করাইলে উপকার দর্শে এবং বয়স্ক ব্যক্তিরাও ইহা হইতে যথেষ্ট উপকার পাইবেন। (ভাইটামিন্ চার্ট দ্রষ্টব্য)

বাদাম।—সর্ব্ববিধ বাদামই পুষ্টিকর খাদ্য। কিন্তু সুলভতা, সহজপ্রাপ্যতা এবং পুষ্টিকারিতাগুণে চীনাবাদামই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ছানা ও মাখন জাতীয় পদার্থ চীনাবাদামে যথেষ্ট পরিমাণে আছে। কাটখোলায় ভাজিয়া, চিনির সহিত পাক করিলে চীনাবাদাম দিয়া একটি উৎকৃষ্ট জলখাবার প্রস্তুত হয়। ইহা 'নকুল দানা' নামে খ্যাত। মধ্যে মধ্যে ঘরে প্রস্তুত করিয়া জলখাবার রূপে ব্যবহার করিলে, অল্প খরচে উৎকৃষ্ট খাওয়া হয়।

এতদ্ব্যতীত, আঙ্গুর, কিস্‌মিস্, খেজুর, পেস্তা প্রভৃতির পুষ্টিকারিতা প্রভৃতি গুণ সম্বন্ধে সকলেই অল্পবিস্তর জ্ঞাত আছেন। এ সকল ফল কিছু মহার্ঘ এবং সাধারণ বাঙ্গালীর সহিত ইহাদের সম্পর্ক খুবই কম।

ইক্ষু।—ইক্ষু ফল নহে, কিন্তু এ স্থলে ইহার গুণাগুণের কথা উল্লেখ করা অবান্তর হইবে না। কাঁচি ইক্ষু—কফকারক এবং মেদোবর্দ্ধক। মাঝারি ইক্ষু—বাত ও পিত্তনাশক। বৃদ্ধ ইক্ষু—বলবর্দ্ধক, ক্ষত ও রক্তপিত্তনাশক। ইক্ষু—দন্তে চর্ব্বণ করিয়া, খাওয়াই উচিত—বিশেষতঃ, শিশু ও বালক বালিকাদিগকে সেই ভাবে খাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য, কারণ, তাহাতে দাঁত শক্ত হয়। অধিকন্তু দন্ত-চর্ব্বিত ইক্ষুরসের গুণ সমধিক। দন্তনিষ্পীড়িত ইক্ষুরস চিনির অপেক্ষা বীর্য্যবান। যন্ত্রনিষ্পীড়িত ইক্ষুরস গুরুপাক এবং বাসি ইক্ষুরস সর্ব্বথা অসেব্য।

নবম অধ্যায়

খাদ্যপ্রাণ (ভাইটামিন্)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের খাদ্যবস্তুর মধ্যে কতিপয় রাসায়নিক উপাদান অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান আছে; কোন কোনটিতে হয়ত, সবগুলিই আছে, আবার কোন কোনটিতে হয়ত দুই একটি আছে। সে সকল উপাদান আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষা, দেহের তাপজনন এবং দেহ-গঠনের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয়। অতএব যদি কৃত্রিম উপায়ে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা উক্ত রাসায়নিক উপাদান সমূহ যথাপরিমাণে মিশ্রিত করিয়া খাদ্য প্রস্তুত করা যায়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা দেহের খাদ্যাভাব মিটিতে পারে এবং খাদ্যগ্রহণের উদ্দেশ্যও সাধিত হইতে পারে। এক কথায়, উহাই হইবে আদর্শ খাদ্য, কিন্তু তাহা হয় না।

বৈজ্ঞানিক দেখিলেন যে, একমাত্র কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত খাদ্য দ্বারা জীবজন্তুকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারা যায় না। তখন তাঁহারা বুঝিলেন যে, স্বভাবজাত খাদ্যবস্তুর মধ্যে পূর্ব্বপরিচিত রাসায়নিক উপাদানগুলি ব্যতীত এমন কিছু আছে, যাহা দেহের বৃদ্ধি ও রক্ষণ-কার্য্যে সহায়তা করে এবং দেহে দোষপ্রতিষেধকতা শক্তি দেয়। উহা কি ? বৈজ্ঞানিকেরা উহার নাম দিয়াছেন—ভাইটামিন্। উহাই খাদ্য-বস্তুর প্রাণ—বীর্য্য—বা এক কথায়, "খাদ্যপ্রাণ"।

এই খাদ্যপ্রাণের অভাব ঘটিলে খাদ্যবস্তুর অন্তর্গত প্রোটীন্ ও অন্যান্য রাসায়নিক উপাদান নিস্তেজ বা হীনবীর্য্য হইয়া পড়ে। তবে, খাদ্যপ্রাণের স্বরূপ কি, তাহা বৈজ্ঞানিক আজও নির্ণয় করিতে পারেন নাই, উহার অস্তিত্বের প্রমাণ পাইয়াছেন মাত্র।

বৈজ্ঞানিকে পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, ঐ খাদ্যপ্রাণ সর্ব্বত্র সমধর্ম্মা নয়, অর্থাৎ মানব ও জীবজন্তুর দেহে উহাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিভিন্নরূপে প্রকাশ পায় এবং খাদ্যপ্রাণের অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব ঐ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দ্বারাই বুঝিতে পারা যায়। এজন্য বৈজ্ঞানিকেরা গুণানুসারে ভাইটামিনের কয়েকটী শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত ছয়শ্রেণীর ভাইটামিন আবিষ্কৃত হইয়াছে। অবশ্য দেশভেদে, জাতিভেদে অনন্তপ্রকার স্বভাবজাত মানবখাদ্য রহিয়াছে, সেগুলির প্রত্যেকটির বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা কোনদিন হইবে কিনা—কে জানে? অতএব, ভাইটামিন সম্বন্ধে শেষসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে মানুষের এখনও বিলম্ব আছে, তবে আবিষ্কৃত ভাইটামিনগুলির আলোচনা করিয়া, বৈজ্ঞানিক কয়েকটি সাধারণ তথ্য নির্ণয় করিয়াছেন। যথা,

(১) কয়েকটি ব্যতীত অধিকাংশ খাদ্যপ্রাণই উদ্ভিদ্‌জগতের।

(২) খাদ্যবস্তুর যে অংশ সূর্য্যের আলোক পায়, সেই অংশই অধিক বীর্য্যবান্।

[এইজন্য ফল, শাকসব্জী, শস্য প্রভৃতির খোসা এবং খোসার সন্নিহিত অংশগুলি অধিক বীর্য্যশালী। পশুমাংসের মধ্যে মস্তক, মেরুদণ্ড ও বক্ষস্থল অধিক বীর্য্যবান্ এবং পশুগণ উদ্ভিজ্জ খাদ্য হইতে খাদ্যপ্রাণ সংগ্রহ করে বলিয়া ইহাদের যকৃত (মেটে) অতিশয় বীর্য্যশালী। যে সকল ক্ষুদ্র মৎস্য উদ্ভিজ্জ পদার্থ খায়, তাহারাও খাদ্য-প্রাণসম্পন্ন। কড্ মৎস্য—ছোট মাছ খাইয়া থাকে, এজন্য কড্ মৎস্য বিপুল খাদ্যপ্রাণসম্পন্ন।]

(৩) প্রাণীজই হউক, অথবা উদ্ভিজ্জই হউক,—টাট্‌কা বা স্বাভাবিক অবস্থায় খাদ্যবস্তুর বীর্য্য বিশুদ্ধ বা পূর্ণ থাকে।

(৪) খাদ্যপ্রাণই খাদ্যের অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদানকে শরীরের যথাস্থানে স্থাপন করে।

(৫) খাদ্যপ্রাণই দেহকে রোগপ্রতিষেধক শক্তি দেয়।

(৬) অগ্নির উত্তাপে খাদ্যবীর্য্যের হ্রাস হয় বা নাশ হয়।

(৭) সংরক্ষণ (preservation) দ্বারাও উহা ধ্বংস হয়।

(৯) খাদ্যবীর্য্য-বিশেষের অভাবে দেহে রোগবিষে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে।

অতএব, আমাদের সর্ব্বাগ্রেই লক্ষ্য করা উচিত যে, আমাদের নিত্যব্যবহার্য্য খাদ্যগুলির মধ্যে কোন্ কোন্ গুলি স্বাভাবিক বিশুদ্ধ অবস্থায় অর্থাৎ টাট্‌কা অবস্থায় রন্ধন না করিয়া ভক্ষণ করিতে পারি। কারণ, তাহা হইলেই আমরা খাদ্যপ্রাণের উপকারিতা পূর্ণমাত্রায় লাভ করিতে পারিব। সাধারণতঃ ফল আমরা টাট্‌কা অবস্থায় খাইয়া থাকি। মূলের মধ্যে শাঁকালু ও মূলা—কাঁচা অবস্থায় খাওয়া চলে। কিন্তু বাঙ্গালী শাকসব্জী আদৌ কাঁচা খায় না। ইংরাজেরা যথেষ্ট পরিমাণে কাঁচা শাকসব্জী খাইয়া থাকেন। শাকশব্জীর মধ্যে লেটুশ, পুঁদনা, চুকাপাঙ্, মূলার শাক, কচি ফুলকফির ফুল, বাঁধা কফির কচি পাতা, বিলাতি বেগুণ, পিঁয়াজ প্রভৃতি কাঁচা অবস্থায় খাওয়া চলে।

ঐ সকল সব্জী কিন্তু গরম জলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া খাওয়া উচিত। তাহাতে খাদ্যবীর্য্যের হ্রাস হয় না, অথচ স্বাস্থ্যবিজ্ঞানসম্মত হয়। যাঁহারা একেবারে কাঁচা খাইতে নারাজ, তাঁহারা নামমাত্র সিদ্ধ করিয়া খাইতে পারেন। মোট কথা, আমাদের বাঙ্গালীর সংসারে যে ভাবে সুসিদ্ধ তরকারী প্রস্তুত হয়, তাহাতে আমরা শাকশব্জীর সম্যক ফললাভে বঞ্চিত। অথচ নানাকারণে ঐরূপ তরকারী বর্জ্জন করিবার উপায় নাই এবং বোধ উচিত উচিতও নয়। এমতাবস্থায় সুসিদ্ধ তরকারীর পরিমাণ কিছু কমাইয়া দিয়া, তৎপরিবর্ত্তে নামমাত্র সিদ্ধ

অথবা গরমজলে ধৌত টাট্‌কা শাকসব্জী প্রত্যহ কিছু খাওয়া উচিত। জলখাবার হিসাবে ভিজামুগ, অঙ্কুরিত ছোলা ও গুড় অতি উত্তম খাদ্য।

মনে রাখিবেন শাক-সব্জী অধিকক্ষণ সিদ্ধ করিলে তাহাদের অন্তর্গত ভাইটামিন্ নষ্ট হইয়া যায়।

এস্থলে, আর একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন মনে করি। আমাদের বাঙ্গালীর সংসারে যে ভাবে তরকারীর খোসা ছাড়ানো হয়, তাহাতে খাদ্যবীর্য্যের অনেকটা অপচয় ঘটে। আলুর খোসা ছাড়ানো উচিত নয়, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যদি নিতান্তই ছাড়াইতে হয়, তাহা হইলে সিদ্ধ করিবার পর ছাড়ানোই ভাল, তাহাতে সারাংশ বজায় থাকে। খাদ্যবীর্য্য সাধারণতঃ খোসার সন্নিহিত স্থানে থাকায়, অসতর্ক ভাবে গভীর রূপে খোসা ছাড়াইলে, সারাংশের অযথা অপব্যয় হয়। নিতান্ত যতটুকু বাদ না দিলে চলে না ততটুকুই বাদ দেওয়া উচিত, অর্থাৎ খোসার কঠিন অংশ, শিরা প্রভৃতি সাবধানে বাদ দিলেই যথেষ্ট।

পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে, সংরক্ষণ দ্বারা খাদ্যপ্রাণ নষ্ট হয়। অতএব সর্ব্ববিধ সংরক্ষিত খাদ্য, শুষ্ক ফল, টিনের বাসি বিস্কুট প্রভৃতি বর্জ্জন করাই উচিত। খাদ্য হিসাবে ইহাদের মূল্য নগণ্য, অথচ অপব্যয়ের মাত্রা বাড়ে। বাজারে প্রচলিত নানাপ্রকার 'ফুড' সম্বন্ধে একথা আরও অধিক পরিমাণে প্রযোজ্য। ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া খাদ্যহিসাবে মূল্যহীন এবং নগণ্য এই সকল অখাদ্য, শিশুখাদ্যরূপে উচ্চমূল্যে ক্রয় করিয়া, অনেকে একদিকে যেমন অপব্যয় করিতেছেন, তেমনি শিশুর স্বাস্থ্যনাশের কারণ হইতেছেন। এ সমস্ত খাদ্যের কুফল সব সময় সদ্যঃ দেখা যায় না বটে, কিন্তু বিলম্বেই হউক, অথবা অবিলম্বেই হউক, ইহারা যে কুফলপ্রসূ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। উহাদের কোন কোনটিতে পুষ্টিকর উপাদান থাকিলেও ঐগুলির

কোনটিই এখানে একেবারে টাট্‌কা অবস্থায় পাইবার উপায় নাই বিদেশ হইতে ঐ সকল দ্রব্য ভারতবর্ষের বাজারে উপস্থাপিত করিতে যত সময় লাগে, তত সময় পর্য্যন্ত উহারা কখনই টাট্‌কা থাকিতে পারে না এবং খাদ্য হিসাবে উহাদের মূল্যের অনেক হ্রাস হয়। সুতরাং বিদেশের কারখানার স্থানীয় বিশ্লেষণ (analysis) দেখিয়া মোহিত না হওয়াই উচিত। মনে রাখিতে হইবে, শুধু রাসায়নিক উপাদানই যথেষ্ট নহে এবং ঐ সকল খাদ্য—খাদ্যপ্রাণহীন।

অত পর, আমরা আবিষ্কৃত খাদ্যপ্রাণগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি। কোন্ কোন্ খাদ্যে কোন্‌টি বিদ্যমান এবং কোনটির অভাবে কি রোগ জন্মিতে পারে, তাহা ও দেখান যাইতেছে। সাধারণতঃ খাদ্যপ্রাণগুলি কোথাও বিপুল বলসম্পন্ন, কোথাও মধ্যমবল এবং কোথাও সাধারণ ভাবে আছে।

খাদ্য প্রাণ 'ক'

কোন্ কোন্ খাদ্যে বিদ্যমান—

(১) বৃহৎ জাতীয় মাছে, মাংসে, ডিমের সারাংশে (পক্ষী ডিম্বে অতিশয় বেশী পরিমাণে)।

(২) যাবতীয় দুধে, দুধের সরে এবং ছানায় অতিশয় বেশী পরিমাণে। মাখন তোলা দুধে সামান্য পরিমাণে।

(৩) টাট্‌কা শাকসব্জী, ফুলকপি, বাঁধাকপি, বিলাতিবেগুণ আলু প্রভৃতিতে। টাট্‌কা পালং শাকে অতিশয় বেশী পরিমাণে।

(৪) যাবতীয় দালে এবং অঙ্কুরিত ছোলা ও মুগে।

(৫) মৎস্য-তৈলে। কড্‌লিভার তৈলে অতিশয় বেশী পরিমাণে।

(৬) ফলের মধ্যে আনারসে অতিশয় বেশী পরিমাণে। পেঁপে, আপেল, বাদাম, চীনাবাদাম, নারিকেল, কাঁঠাল ও বেলে আছে।

মন্তব্য—শিশুর অকালমৃত্যু, উদরাময়, যকৃতের পীড়া প্রভৃতির অন্যতম প্রধান কারণ—খাদ্যদ্রব্যে 'ক' খাদ্যপ্রাণের অভাব। যথোপযুক্ত মাতৃস্তন্য এবং গাভীদুগ্ধের পরিবর্ত্তে যাহাদিগকে অসার পেটেণ্ট 'ফুড্' খাওয়ানো হয়, সেই সকল শিশু উপরোক্ত রোগসমূহে ভুগিয়া থাকে। গাভীর দুধে "ক". ভাইটামিনের স্বল্পতা বা প্রাচুর্য্য গাভীর খাদ্যের উপর নির্ভর করে। যে সকল গাভী যথেষ্ট পরিমাণে তাজা ঘাস খায়না, তাহাদের দুধে "ক" ভাইটামিন অল্প থাকে। অতএব, দুধ খাঁটি হইলেই যে তাহাতে "ক" ভাইটামিন বেশী আছে, এমন কথা বলা যায় না। সাধারণতঃ বৎসরের যে সময়ে বা যে ঋতুতে তাজা ঘাসের অপ্রাচুর্য্য ঘটে, সে সময়ে গাভীর দুধে "ক" ভাইটামিন্ কমিয়া যায়। বৈজ্ঞানিকেরা গাভীকে কড্‌লিভার অয়েল খাওয়াইয়া দেখিয়াছেন যে, তাহাতে গাভীর দুগ্ধে "ক" ভাইটামিন্ বাড়িয়া যায়। সুতরাং, স্তন্যদায়িনী মাতার খাদ্যে যাহাতে যথোপযুক্ত পরিমাণে "ক" ভাইটামিনপূর্ণ দ্রব্যাদি থাকে সে দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। নচেৎ, মাতৃদুগ্ধে "ক" ভাইটামিনের অপ্রাচুর্য্য ঘটিবে। উত্তম কড্‌লিভার তৈলে মাখন অপেক্ষা ২৫০ আড়াই শতগুণ বেশী পরিমাণে এবং টাট্‌কা পালংশাকে মাখন অপেক্ষা ৩ তিনগুণ বেশী পরিমাণে "ক" ভাইটামিন্ আছে। দুঃখের বিষয়, বাজারে যে সকল কড্‌লিভার ওয়েল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সকলগুলিই উত্তম এবং প্রথম শ্রেণীর নহে। বলা বাহুল্য যে, আমরা যে ভাবে পালংশাক রাঁধিয়া খাই, তাহাতে উহার খাদ্যবীর্য্য অধিকাংশই নষ্ট হইয়া যায়।

অধুনা প্রচলিত ভেজিটেবিল ঘৃতে "ক" খাদ্যপ্রাণ আদৌ নাই।

যদি মুখ ঢাকা পাত্রে মৃদুজ্বালে মাখন জ্বাল দিয়া ঘৃত প্রস্তুত করা না হয়, তাহা হইলে ঘৃতের অন্তর্গত "ক" ভাইটামিন অনেকাংশে অথবা সমূহ বিনষ্ট হইয়া যায়। আমাদের দেশে, ঘৃত প্রস্তুত করিবার সময়

কুত্রাপি এরূপ সাবধানতা অবলম্বন করা হয় না বলিয়াই, আমাদের বিশ্বাস। জ্বালের সময় বায়ু সংস্পর্শে খাদ্যের "ক" ভাইটামিন্ কতকাংশে বা সমূলে নষ্ট হয়।

এই খাদ্যপ্রাণের অভাবে শারীরিক শীর্ণতা, বুদ্ধিহীনতা, রক্তাল্পতা এবং ক্ষুধা ও দৃষ্টিশক্তির হ্রস্বতা জন্মে। ইহার অভাবে বয়স্ক ব্যক্তিরও রোগ প্রতিরোধের শক্তি কমিয়া যায়।

খাদ্যপ্রাণ 'খ'

কোন্ কোন্ খাদ্যে বিদ্যমান—

(১) ডিম্বে।—মৎস্য ডিম্বে বেশী। মাংসে অল্প পরিমাণে।

(২) যাবতীয় দুধে, ঘোলে এবং ছানায়। কিন্তু মাখনে নাম মাত্র।

(৩) ঢেঁকিছাঁটা চাল, চিঁড়া, দাল, গম (ধব্‌ধবে শাদা ময়দা অপেক্ষা লাল যাঁতায় ভাঙ্গা আটায় বেশী), সাগু, বার্লী, রাই, ভুট্টা, জই প্রভৃতি শস্যে।

(৪) শাকসব্জীতে। পালং শাকে এবং ঢেঁড়শে অতিশয় বেশী পরিমাণে। টাট্‌কা মটরশুঁটী, অল্প সিদ্ধ আলু, পিঁয়াজ, লেটুশ্‌ শাক, ফুলকপি, বিলাতী বেগুন এবং শালগমে কিছু বেশী মাত্রায়।

(৫) নানাবিধ ফলে। নারিকেল, বাদাম, আখরোট, পেঁপে, আপেল আঙ্গুর, কাগজি ও পাতিলেবু, আনায়স, কমলালেবু এবং বাতাবী-লেবুতে কিছু বেশী মাত্রায়। আম, জাম, কদলী ও শশাতেও আছে।

মন্তব্য।—মানবদেহের অন্ত্র ও স্নায়ুমণ্ডলীর উপর এই জাতীয় খাদ্যপ্রাণ কার্য্য করিয়া থাকে এবং তাহাদিগকে সবল রাখে। আমরা

যে ভাবে ভাত খাইয়া থাকি, তাহাতে চাউলের 'খ' খাদ্যপ্রাণ নর্দ্দমার আশ্রয় লাভ করে। অর্থাৎ, ফেন গালার সঙ্গে বাহির হইয়া যায়। এই "খ" খাদ্য প্রাণের অভাবে পিত্তের বিকার, ক্ষুধামান্দ্য, পরিপাক শক্তি-হীনতা, উদ্যমহীনতা ও নানাবিধ স্নায়ুবিকার উপস্থিত হয়। ইহার অভাবে প্রধানতঃ বেরিবেরি রোগ জন্মিয়া থাকে।

বৈজ্ঞানিকেরা দেখিয়াছেন যে খাদ্যে "খ" ভাইটামিনের মাত্রা কম থাকিলে, স্তন্যদায়িনী জননীর স্তনদুগ্ধের স্বল্পতা ঘটে। এমন কি, একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষ অপেক্ষা, একজন স্তন্যদায়িনী জননীর খাদ্যে ৩ হইতে ৫ গুণ অধিক পরিমাণে ভাইটামিন্ "খ" থাকা প্রয়োজন। অতএব দুগ্ধপোষ্য শিশুর মাতার খাদ্য বস্তুতে যাহাতে "খ" ভাইটামিন্‌পূর্ণ দ্রব্যাদি যথেষ্ট থাকে, সে দিকে সর্ব্বাগ্রে লক্ষ্য রাখা উচিত। নচেৎ, স্তনদুগ্ধের স্বল্পতা ঘটিবে।

খাদ্যপ্রাণ 'গ'

কোন্ কোন্ খাদ্যে বিদ্যমান—

(১) কাঁচা ফলমূলে।—টাট্‌কা পাতি লেবুর রস, কমলালেবুর রস, আনারস ও টেঁপারীতে অতিশয় বেশী পরিমাণে। কলা, আপেল, আঙ্গুর, পিচ্‌ফল এবং পাতি লেবুতে কিছু বেশী মাত্রায়। আম, জাম, কাঁঠাল, বেল এবং তালশাঁসেও বর্ত্তমান।

(২) তাজা শাকসব্জিতে।—বিলাতীবেগুন, বাঁধাকপি, লেটুশ শাক, টাট্‌কা মটরশুঁটি, পালংশাক, মূলার খোসা এবং শালগমে অতিশয় বেশী পরিমাণে। কাঁচকলা, আলুর খোসা, অল্পসিদ্ধ আলু, পিঁয়াজ এবং অঙ্কুরিত ছোলা ও মুগে কিন্তু বেশী মাত্রায়।

(৩) দুধেও আছে, কিন্তু বেশী নয়।

মন্তব্য—ইহার অভাবে 'স্কার্ভি' নামক রোগ জন্মে, এই রোগে শিশুদের অস্থি নরম হইয়া যায় এবং দাঁতের মাড়ী নরম হয় ও দাঁত খারাপ হয়। বয়স্কদিগকেও এই রোগ ধীরে ধীরে আক্রমণ করে। এজন্য টাট্‌কা শাকসব্জি ও শস্য সর্ব্বদা ব্যবহার করা উচিত। শুষ্ক শাকসব্জি ও শস্যাদিতে এবং প'নের মিনিটের অধিককাল সিদ্ধ তরকারিতে ও দুইবার জ্বাল দেওয়া দুধে 'গ' খাদ্যপ্রাণ সমূলে বিনষ্ট হয়।

খাদ্যপ্রাণ 'ঘ'

কোন্ কোন্ খাদ্যে বিদ্যমান—

(১) মাছের ও পক্ষীর ডিম্বে। কড্‌লিভার তৈলে।

(২) কাঁচা দুধে বেশী পরিমাণে। একবল্‌কা দুধে তাহাপেক্ষা কম। বেশী জ্বাল দেওয়া দুধে থাকে না। স্তনদুধে বেশী আছে। যে সকল গাভী বা ছাগল যথেষ্ট পরিমাণে তাজা ঘাস খাইতে পায় না অথবা সম্বৎসর একস্থানে আবদ্ধ থাকে, তাহাদের দুধে 'ঘ' খাদ্যপ্রাণ থাকে না

মন্তব্য—দেহের অস্থির উপরেই এই খাদ্যপ্রাণ ক্রিয়াশীল এবং ইহার অভাবে শিশুদিগের রিকেট্‌স্ রোগ হয়—দাঁত সহজে উঠেনা, এবং অস্থি বক্র হইয়া যায়।

খাদ্যপ্রাণ 'ঙ'

কোন্ কোন্ খাদ্যে বিদ্যমান—

প্রায় প্রত্যেক, প্রাণীদেহে, বিশেষতঃ সদ্যঃপ্রসূত প্রাণী-দেহে

(২) গমে এবং শাকসব্জী ও মটরে।

মন্তব্য—এই খাদ্যপ্রাণের অভাবে বন্ধ্যাত্ব দোষ ঘটে, অথবা গর্ভস্থ ভ্রূণ আশু বিনষ্ট হয়। সদ্যঃজাত ছাগশিশুর মাংস খাইলে, অথবা গম হইতে প্রস্তুত তৈল খাইলে, এই দোষ দূর হয়, শুনা যায়।

খাদ্যপ্রাণ 'চ'

এই খাদ্যপ্রাণ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ এখনও কিছু স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। রোগবিশেষে খাদ্যবিশেষের যথেষ্ট প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়—যেমন যক্ষ্মারোগে কড্‌লিভার তৈল রোগীকে রোগের সহিত যুঝিবার শক্তি দান করে, এই যে যুঝিবার শক্তিদান, ইহা এক একজাতীয় খাদ্যপ্রাণের ধর্ম্ম। বৈজ্ঞানিকেরা উহাকেই খাদ্যপ্রাণ 'চ' আখ্যা দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে এখনও পরীক্ষা শেষ হয় নাই।

দশম অধ্যায়

আহারের পরিমাণ

আহারের পরিমাণ সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে জানা উচিত যে, অমিত ভোজন অনন্ত দোষের আকর।

খাদ্যবস্তুর উপাদান সম্বন্ধে এতক্ষণ আলোচনা করিয়া, সংক্ষেপে দেখাইয়াছি, দেহের পক্ষে কোন্ কোন্ জাতীয় খাদ্য হিতকর। কিন্তু যিনি স্বাস্থ্যসুখ ও দীর্ঘজীবন কামনা করেন, তাঁহাকে শুধু হিতভোজী হইলেই চলিবে না, মিতভোজীও হইতে হইবে। অধিকাংশ ব্যাধিরই মূল কারণ—হয় অহিত ভোজন, নয় অতি ভোজন।

বয়স ও অবস্থাভেদে আহারের একটা মাত্রা আছে, যে মাত্রাপেক্ষা বেশী বা কম আহার করিলে স্বাস্থ্য বজায় থাকে না। এ মাত্রা কতটা হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে অনেকেরই মোটামুটি একটা ব্যক্তিগত ধারণা আছে। যদি অল্প কথায় মিত ভোজনের একটা সংজ্ঞা দিতে হয়, তাহা হইলে বলিব,—যতটা আহার করিলে মনে হয় —সম্পূর্ণরূপে ক্ষুধা নিবারিত হইয়াছে, অথচ ইচ্ছা করিলে আরও কিছু খাওয়া যায়, মাত্র ততটা আহার করার নামই মিতভোজন। তদতিরিক্ত বা তদপেক্ষা কম খাওয়া উচিত নহে।

প্রথমেই দেখা যাক, গুরু ভোজনে কি কি কুফল জন্মিতে পারে। খাদ্যদ্রব্য পরিপাক করিয়া, আমরা তাহার সারাংশ গ্রহণ করি এবং অসার অংশ মলাদিরূপে শরীর হইতে বাহির করিয়া দেই। এই গ্রহণ ও বর্জ্জন কার্য্যে কতকটা শক্তির ব্যয় হয়। যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে শরীর-যন্ত্রগুলিকে

অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয়, কাজেই শক্তি অত্যধিক ব্যয়িত হয়; এমতাবস্থায় মানুষের মানসিক শ্রম করিবার শক্তি হ্রাস পায়। কারণ দেহের কাজে অনেকটা শক্তি ক্ষয় হওয়াতে, উহা মানসিক বিকাশে সহায়তা করিতে পারে না। গোজাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা এক কালে অধিক পরিমাণে আহার করিয়া লয়, পরে দিনের অধিকাংশ সময় উক্ত আহার্য্য রোমন্থন করে। মানুষ রোমন্থনকারী জীব নহে, এবং তাহার দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় অনেকখানি মানসিক শক্তির দরকার হয়। গুরু ভোজন এই মানসিক শক্তি বিকাশের অন্তরায়।

দ্বিতীয়তঃ, গুরুভোজনে পরিপাকযন্ত্রাদির অত্যধিক পরিশ্রম হয় বলিয়া, উহারা ক্রমশঃ বিকল এবং দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। যন্ত্রমাত্রেরই কার্য্যক্ষমতার একটা সীমা আছে, তদধিক কার্য্য করিতে বাধ্য করিলে উহারা শীঘ্রই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। পরিপাক যন্ত্রাদি সম্বন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য। এইজন্যই অমিত ভোজন অকালমৃত্যুর একটি কারণ। আমাদের দেশের সাধারণ লোকেরা, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা অনেক সময়ে বলিয়া থাকেন,—"যার যতদিন অন্নজল মাপা আছে, তার ততদিন আয়ু।" একথার অর্থ হইতেছে এই,—ভগবান যেন প্রত্যেক জীব-সৃষ্টির সময় তাহার আহার্য্যের একটা পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন, সেই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অংশটুকু যে যখন শেষ করিয়া ফেলে, তখন তাহাকে চিরবিদায় লইতে হয়। আমরা এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর আখ্যায়িকা নিম্নে দিতেছি।

একদিন নারদ ঋষি পৃথিবী-পর্য্যটন কালে এক গ্রামে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, পথের ধারে দুইজন অনাহারক্লিষ্ট দরিদ্র লোক বসিয়া আছে। ঋষি সম্মুখীন হইলে তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া উভয়েই কহিল, "ঠাকুর! আর ত পারিনা, খেতে না পেয়ে যে প্রাণ যায়।—এবারে গোলোকে গিয়ে নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করবেন যে,

এভাবে আমাদের আর কত দিন চ'লবে হয় তিনি আমাদের প্রাণান্ত করুন, না হয় আহারের একটা সুব্যবস্থা করে দিন।" এই ভাবে তাহারা ঋষির কাছে নানারূপ কাতোরোক্তি করিতে লাগিল। তাহাদের ব্যথায় ব্যথিত হ'য়ে নারদ আশ্বাস দিলেন যে, তিনি নারায়ণের কাছে তাহাদের আর্‌জিটুকু পেশ করিবেন।

যথাসময়ে নারদ তা'দের অবস্থার কথা নারায়ণের কাছে বিশেষ ভাবে জানাইয়া কহিলেন—"প্রভু! এদের একটা বিহিত না ক'র্‌লে আর চলেনা।"

অন্তর্যামী সস্নেহে কহিলেন,—"নারদ, তাদের কথা আমি জানি। তাদের যা' প্রাপ্য, তাই তারা পেয়েছে। তার বেশী পাবে কি করে?

নারদ বিশেষ করিয়া ধরিয়া বসিলেন,—"সে হবেনা, দয়াময়! কিছু তাদের দিতেই হবে। আমি অনেক আশ্বাস দিয়ে এসেছি। আহা, বেচারিরা কিছুকাল খেয়ে দেয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকুক!"

নারদের আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া নারায়ণ বলিলেন —আচ্ছা বৎস, তোমার কথায় এবার তাদের আমি কিছু দিচ্ছি। কিন্তু সাবধান, পুনরায় চাহিওনা, ত্রিসংসারের খাদ্য আমায় যোগাইতে হয়, আমি শুধু তাদেরই নহি। যাও বৎস! তুমি ব্রাহ্মণ-বেশে গিয়ে, তাদের প্রত্যেককে পঞ্চাশ মণ ক'রে আহার্য্য দিয়ে এস।"

নারদ পুলকভরে কহিলেন "যথেষ্ট, প্রভু। এতেই তাদের বহুদিন সুখে কেটে যাবে।" নারায়ণের আদেশ মত নারদ ব্রাহ্মণ-বেশে তাঁদের উপরোক্ত পরিমাণ খাদ্য দিয়া আসিলেন।

বহুকাল পরে, নারদ ঘটনাক্রমে সেই গ্রামে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, সেই দুই ব্যক্তির একজন বহুদিন পূর্ব্বেই মারা গিয়াছে, কিন্তু অপর জন অপ্রত্যাশিতরূপে জীবিত! বিস্মিত নারদ গোলকে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, নারায়ণকে প্রশ্ন করিলেন,—প্রভু! সেই

দুই ব্যক্তির একজন বহুপূর্ব্বেই মরিয়াছে, কিন্তু অপর ব্যক্তি এখনও জীবিত আছে কিরূপে? তাহার নির্দ্দিষ্ট খাদ্য ত এত দিনে নিঃশেষ হইয়া যাইবার কথা।”

নারায়ণ সস্নেহে কহিলেন—‘বৎস, যে ব্যক্তি মারা গিয়াছে, সে তাহার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য অতিভোজনে আশু নিঃশেষ করিয়াছে। কিন্তু অপর ব্যক্তি যে জীবিত আছে, সে আমাকে ভারি বিপদে ফেলিয়াছে। ঐ ব্যক্তি নিজের প্রাণ-ধারণের উপযোগী আহার্য্য মাত্র গ্রহণ করে, কাজেই তাহার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ এখনও শেষ হয় নাই। অধিকন্তু, সেই প্রথম যেদিন তুমি তাহাকে খাদ্য দিয়া আসিয়াছিলে, সেইদিন হইতে প্রত্যহ নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্যাংশ অপরকে বিলাইয়া দেয়। কাজেই আমাকেও প্রত্যহ আহার যোগাইতে হইতেছে।

পুলকিত নারদ হর্ষভরে কহিলেন, “ধন্য ভগবান্! ধন্য মানব!”

বলা বাহুল্য, রোগপ্রপীড়িত দুর্ব্বিসহ দীর্ঘজীবন কেহই চায় না। মানব দীর্ঘজীবন চায় সত্য, কিন্তু তৎসহ চায়—আরোগ্য, পুষ্টি ও তুষ্টি। অমিত ভোজন এই তিনটি কাম্যবস্তু লাভের ব্যাঘাত জন্মায়। অমিত ভোজনের ফলে খাদ্যের অতিরিক্ত অংশ যথাযথ পরিপাক প্রাপ্ত না হইয়াই অন্ত্রমধ্যে স্থান লাভ করে এবং তথায় দূষিত পদার্থের সৃষ্টি করে। ঐ দূষিত পদার্থের কতকাংশ রক্তে শোষিত হইয়া রক্তকে কলুষিত করে এবং নানাবিধ রোগের মূলীভূত কারণ হয়। কাজেই খুব বেশী খাইয়া যাঁহারা বেশী পুষ্টির আশা করেন, তাঁহারা ফলতঃ লাভ করেন রোগ, শক্তিহীনতা এবং অস্বাচ্ছন্দ্য।

সাধারণতঃ যৌবনে অমিতভোজনের ফলেই প্রৌঢ়াবস্থায় বা বার্দ্ধক্যে বহুমূত্র রোগ দেখা দেয়। বাতরোগ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অধিক ভোজনের ফল-সম্ভূত। অজীর্ণও অতিভোজনের অনুচর।

উপরোক্ত তিনটি রোগই বাঙ্গালাদেশে কিরূপ বিস্তার লাভ করিয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। শ্রমবিমুখতাও ঐ সকল রোগের অন্যতম কারণ।

এস্থলে একটি সামাজিক ব্যাধির উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। নিমন্ত্রণ বাড়ীতে বা ভোজে খাদ্যদ্রব্যের বিপুল সমারোহ করা একটা ব্যাধিতে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বের সেই সরল, অনাড়ম্বর, বাহুল্য বর্জ্জিত অথচ প্রকৃত স্বাস্থ্যপ্রদ খাদ্যদ্রব্যের সমাবেশ আর দেখিতে পাওয়া যায় না, তৎপরিবর্ত্তে অনাবশ্যক বাহুল্য দোষে দুষিত, অপব্যয়ের কতকগুলি নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র.। ইহা মার্জ্জিত রুচির লক্ষণ নহে, রুচিবিকার। ইহাতে দাতার অলঙ্কার ও আত্মাভিমান প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু এক খুব ধনী ব্যক্তি ব্যতীত অপরে ঠিক আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন কি না সন্দেহ, কারণ অনেকেই এরূপ অয়োজন—দায়ে ঠেকিয়া, মানের দায়ে, অপরের অনুকরণে করিাত হয়। বাঙ্গালীর ভোজের আয়োজন দেখিলে স্বতঃই মনে হইবে, বাঙ্গালী ভদ্রলোক—খাইবার জন্যই বাঁচিয়া থাকে, বাঁচিয়া থাকিবার জন্য খায় না।

আজকাল অনেক বাঙ্গালী ছাত্র ব্যায়ামচর্চ্চার দিকে দৃষ্টি দিয়াছেন। তাঁহাদের অনেকের ধারণা যে ব্যায়ামের দ্বারা শরীরকে, উপযুক্তরূপে গঠিত করিতে হইলে খুব অধিক পরিমাণে খাওয়া দরকার। এ ধারণা ভ্রমাত্মক। সাধারণ পুষ্টি কর খাদ্য যথাপরিমাণে খাইলেই যথেষ্ট। পশ্চিমা পালোয়ানেরা ঐ ভ্রমাত্মক ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া বিপুল পরিমাণে আহার করে। ফলে প্রায়ই তাহাদের উদর স্ফীত হয়, অর্থাৎ ভুঁড়ি হয়। অপিচ, অতিভোজনের কুফল শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক, ইহাদের দেহে প্রকাশ পাইয়া থাকে। শরীর শুধু সবল হইলেই চলিবে না, দ্রুত কার্য্যতৎপর হওয়া চাই, ইউরোপীয় ও

জাপানী পালোয়ানদের মধ্যে লম্বোদর দেখা যায় না, কারণ তাহারা হিতকর দ্রব্য পরিমিত মাত্রায় ভোজন করে। মাত্রা সম্বন্ধে গোড়া হইতেই তাহারা যথোচিত শিক্ষা পাইয়া থাকে।

পক্ষান্তরে, এমন কতকগুলি ব্যায়াম-ক্রীড়া এ দেশে আমদানি হইয়াছে, যাহা শীতপ্রধান দেশের উপযোগী হইলেও, আদৌ এ দেশবাসীর ধাতুর উপযোগী নহে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ফুট্‌বল খেলায় অত্যধিক শারীরিক অপচয় ঘটে। অথচ বাঙ্গালীর ছেলে ফুটবল খেলিয়া শাকান্নাদি যাহা গ্রহণ করে, তাহা ঐ অপচয় নিবারণের পক্ষে যথেষ্ট নহে। ফলে উহাদের রোগ-প্রতিষেধক-শক্তি কমিয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গেই ফুটবল খেলার প্রচলন অধিক। শুনা যায়, ফুটবল খেলার ফলেই সেখানকার অনেক ছাত্রের মধ্যে যক্ষ্মারোগ দেখা দেয়। ফুটবল খেলার চেয়ে কপাটি খেলা লক্ষ গুণে শ্রেয়ঃ।

শিশুদিগের খাদ্যের মাত্রা সম্বন্ধে আমাদের পুরমহিলারা যথেষ্ট অজ্ঞতার পরিচয় দিয়া থাকেন। প্রথমতঃ যে সকল শিশুর কথা ফুটে নাই, তাহাদের কথা ধরা যাক। শিশু ক্ষুধা পাইলে কাঁদে সত্য, কিন্তু জঠর-জ্বালা ব্যতিরেকে অন্য কারণেও যে শিশু কাঁদিতে পারে, সে কথা জননীরা প্রায় ভুলিয়া যান। শিশু কাঁদিলেই তাহার মুখে স্তন্যদান করা হয়। এ বিষয়ে দিদিমা, পিসীমা, ঠাকুরমারাই বেশী অপরাধী। হয়ত সে সময়ে বাস্তবিকই শিশুর ক্ষুধা পায় নাই, পূর্ব্বভুক্ত দুধ জীর্ণ না হওয়াতে তাহার পেট কামড়াইতেছে। কাজেই সেক্ষেত্রে স্তন্য অমৃতের কাজ না করিয়া গরলেরই কাজ করে। শিশু ঠিক ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদিতেছে, কি তাহার পেট কামড়াইতেছে, বা কাণ কট্‌কট্‌ করিতেছে, সেটুকু বুঝিয়া তাহাকে আহার দেওয়া উচিত। নচেৎ, অজীর্ণ, উদরাময়, দুধ-তোলা প্রভৃতি রোগ হইবার সম্ভাবনা। ছোট ছোট শিশুদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া খাওয়ানো কোন ক্রমেই উচিত নহে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যতটা আহার করিলে ক্ষুন্নিবারণ হয়, অথচ, পাকস্থলীতে কিছু স্থান খালি থাকে, তাহাই আহারের যথার্থ পরিমাণ। অতএব, আহারের পরিমাণ সম্বন্ধে কোন একটা বাঁধাধরা নিয়ম স্থষ্টি করা যায় না। পাত্রভেদে ইহার বিভিন্নতা হইবেই। সাধারণতঃ দেহের দৈর্ঘ্য, পরিসর ও ওজনের তারতম্যানুসারে আহারের পরিমাণের তারতম্য হয়। আরও একটি দ্রষ্টব্য বিষয়,—যাঁহাদের শারীরিক পরিশ্রম বেশী করিতে হয়, তাঁহাদের শর্করাপ্রধান শালিজাতীয় খাদ্য অর্থাৎ চাল, গম প্রভৃতি বেশী প্রয়োজন হয় এবং যাঁহারা মস্তিষ্কজীবি তাঁহাদের আমিষ জাতীয় অর্থাৎ মাছ, মাংস, ছানা প্রভৃতি বেশী দরকার।

আরও দেখা যায়, দেশ ও কাল ভেদে আহারের পরিমাণের তারতম্য হয়। একজন বাঙ্গালীর পক্ষে যাহা যথেষ্ট, একজন পাঞ্জাবী বা পেশোয়ারীর পক্ষে তাহা যথেষ্ট নহে। আবার, শীতকালে যতটা খাদ্য অক্লেশে পরিপাক করিতে পারা যায়, গ্রীষ্মে বা বর্ষায় ঠিক ততটা পরিপাক করা যায় না।

যাহাই হাউক, আহার সম্বন্ধে প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরই স্ব স্ব মাত্রা জ্ঞান থাকা উচিত। সঙ্গে সঙ্গে, খেয়াল রাখিতে হইবে যে, উক্ত নিয়মানুসারে গ্রহণযোগ্য খাদ্যে যথাসম্ভব খাদ্যের কার্য্যকর উপাদানগুলি যেন বিদ্যমান থাকে। অর্থাৎ, যথাসম্ভব মিশ্রখাদ্যই খাওয়া উচিত; নচেৎ, খাদ্যগ্রহণের সমস্ত উদ্দেশ্য সফল হয় না। বিভিন্ন গুণসম্পন্ন খাদ্য না খাইলে, দেহের সম্যক্ পুষ্টি ও ক্ষয় নিবারণ হইবে না।

পণ্ডিতেরা বিভিন্ন বয়সের উপাযোগী এক একটা খাদ্য-তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। সে তালিকা অনুসারে কার্য্য করিলে,—সুফল লাভের আশা করা যায়। আমরা নিয়ে সে তালিকা সঙ্কলন করিয়া দিলাম। শিশু-খাদ্য সম্বন্ধে আমরা স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বলিব।

দৈনিক খাদ্য তালিকা

(স্বর্গীয় রসায়নাচার্য্য ডাঃ চুণীলাল বসু)

ব্যায়ামশীল উন্নতদেহ বাঙ্গালী বয়স্ক ছাত্রের—

চাউল—২ ½ ছটাক। দাল—১ ছটাক। মাছ বা মাংস—৩ ছটাক। আলু ও অন্যান্য তরকারী—৫ ছটাক। আটা—৫ ছটাক। সুজী—১ ছটাক। ঘৃত ও তৈল—১ ছটাক। চিনি বা গুড়—½ ছটাক। দধি—২ ছটাক।

সহজ পরিশ্রমী পূর্ণবয়স্ক ১॥• মন ওজনের বাঙ্গালী ভদ্রলোকের—চাউল—৩ ছটাক। আটা—৫ ছটাক। দাল—½ ছটাক। মাছ বা মাংস—২½ ছটাক। আলু—২ ছটাক। অন্যান্য তরকারী—২ছটাক। তৈল বা ঘৃত—½ ছটাক। দুগ্ধ—৮ ছটাক। লবণ—½ ছটাক। মসলা—যথাপরিমাণ।

একাদশ অধ্যায়

আহারবিধি—

আহারবিধি সম্বন্ধে কয়েকটি সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয় আমরা নিম্নে সন্নিবেশিত করিলাম।—

(১) প্রত্যহ প্রত্যুষে খালি পেটে একগ্লাস শীতল বা সহ্যমত গরম জল পান করিলে, কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। অনেক পুরাতন কোষ্ঠবদ্ধ রোগী ঐ অভ্যাসের ফলে সুফল পাইয়াছেন।

"দিনান্তে চ পিবেৎ দুগ্ধং নিশান্তে চ পিবেৎ পয়ঃ।
ভোজোনান্তে পিবেৎ তক্রং কিং বৈদ্যস্য প্রয়োজনম্॥"

দিনান্তে দুগ্ধ, প্রত্যুষে জল এবং ভোজনান্তে ঘোল পান করিলে, বৈদ্য ডাকার প্রয়োজন হয় না। রাত্রে শয়নের এক ঘণ্টা পূর্ব্বে দুগ্ধ পান করিলে দিবাভাগে কুখাদ্য ভোজন জনিত যে বায়ু পিত্তের সঞ্চার হয়, তাহা নিবারিত হয়।

(২) অজীর্ণ ও বাত রোগে 'চা' বিষবৎ পরিত্যাজ্য। প্রত্যুষে চা সেবন—পরিপাক-শক্তি হীনতার অন্যতম কারণ। চায়ের খাদ্যহিসাবে কোনই মূল্য নাই, অথচ অপকারিতা যথেষ্ট। প্রাতে চায়ের পরিবর্ত্তে ঈষদুষ্ণ জলে একটা পাতিলেবুর রস মিশাইয়া পান করিলে, সকলেই উপকার পাইবেন, শিশুদের পক্ষে ইহা মহা উপকারী এবং বাত ও অজীর্ণ রোগীর ইহা নিত্যসেব্য ঔষধও বটে।

(৩) দিবসে প্রথম প্রহরের মধ্যে আহার করা উচিত নয়। ভাবমিশ্র বলেন,—"যাম মধ্যে ন ভোক্তব্যং, যামযুগ্মং ন লঙ্ঘয়েৎ।" অর্থাৎ প্রথম প্রহর বাদ দিয়া, দ্বিতীয় প্রহর মধ্যে আহার করা উচিত। আমাদের মধ্যে হয়, বেলা নয়টা হইতে এগারোটার মধ্যেই আহারের প্রশস্ত কাল। অবশ্য রোগী ও শিশুর পক্ষে এ নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপাল্য নহে। রাত্রেও একপ্রহর গত হইলে এবং দ্বিতীয় প্রহর মধ্যে আহার শেষ করা কর্ত্তব্য।

(৪) শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—"অস্নাতাশী মলং ভুঙ্‌ক্তে" (আহ্নিক তত্ত্বম্) অর্থাৎ, স্নান না করিয়া যে খায়, সে মল ভোজন করে। বলা বাহুল্য, এখানে সুস্থদেহ ব্যক্তির কথাই বলা হইতেছে। স্নানের উদ্দেশ্য কি, তাহা লক্ষ্য করিলে আমরা শাস্ত্রকারের কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি। "স্নানেন শুদ্ধি, ন তু চন্দনেন।" অপিচ, "নৈর্ম্মল্যং ভাবশুদ্ধিশ্চ বিনা স্নানং ন জায়তে।" অর্থাৎ, নির্ম্মলতা ও মনের

শুদ্ধি—স্নান ব্যতিরেকে হয় না। স্নানের এই ফলটুকুর দিকে লক্ষ্য রাখিলে, আমরা বুঝিতে পারি যে, আহারের পূর্ব্বে শারীরিক নির্ম্মলতা ও মানসিক শুচিতা আবশ্যক,—শাস্ত্রকার এই কথাই বলিতেছেন। অপরন্তু, হাত মুখ না ধুইয়া খাইলে, কতকটা মল বা ময়লা যে পেটের মধ্যে যায়,—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

(৫) গুরুতর শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমের অথবা উত্তেজনার পরেই, অথবা অশান্ত মনে আহার করিলে ভুক্তদ্রব্য সহজে জীর্ণ হয় না।

(৬) শাস্ত্রকার বলিয়াছেন, ভোজনের অব্যবহিতপূর্ব্বে পঞ্চার্দ্র হইয়া, অর্থাৎ, হস্তদ্বয়, পদদ্বয় ও মুখ প্রক্ষালন পূর্ব্বক আহার করা উচিত। এ কথা যে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানসম্মত, সে বিষয়ে লিপি-বিস্তারের প্রয়োজন নাই। হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় ধৌত করিলে, শ্রান্তিনাশ হয় ও শরীর শীঘ্রই স্নিগ্ধ হয় এবং একটা স্বস্তিবোধ ও শুচিভাব জন্মে।

(৭) ভোজ্যবস্তু শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে হয়। শাস্ত্রে কথিত আছে, অনিবেদিত খাদ্য গ্রহণ করিতে নাই। ভগবানের প্রসাদ রূপে যদি খাদ্য গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে স্বতঃই মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক হইয়া থাকে। অতএব ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করিয়াই খাওয়া উচিত। তাহাতে অন্ন প্রীতিপ্রদ হয়।

(৮) পরস্পর সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্য একত্রে আহার করিতে নাই। যথাঃ—নানাজাতীয় মাংস একত্রে রাঁধা হইলে পরস্পর বিরুদ্ধ হয়। জলবহুল স্থানের পশুর মাংস ও মৎস্যের সহিত দুগ্ধ ক্ষীর ও পায়স ভোজন অকর্ত্তব্য। সরিষার তৈলে ভর্জ্জিত কপোত মাংস অভক্ষ্য। গুড় অথবা মধুর সহিত মৎস্য মাংস খাইতে নাই। দুগ্ধযুক্ত ছাতুর সহিত মাংস খাওয়া অনুচিত। উষ্ণ দ্রব্যের সহিত দধি অথবা মধু ভোজন নিষিদ্ধ। দধি, তক্র ও বিল্বফলের সহিত কদলী অভক্ষ্য। সমান ভাগে মিলিত, মধু ও ঘৃত বিষবৎ। খিচুড়ীর সহিত পায়স ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

মাংসের সহিত তৈল মিশ্রিত করিয়া খাইতে নাই। মাংস প্রস্তুত করিবার সময় অনেকে প্রথমে উহা তৈলে ভাজিয়া লয়েন। এ অভ্যাস পরিত্যাগ করা উচিত। ঘৃতে মৎস্য ভাজা অথবা মাছের কালিয়াতে তৈলের পরিবর্ত্তে ঘৃত ব্যবহার করা আজকাল ফ্যাসান হইয়াছে। এরূপ রন্ধন অস্বাস্থ্যকর।

(৯) অগ্নিপক্ক অন্ন ব্যাঞ্জনাদি পুনরায় উষ্ণ করিয়া খাওয়া উচিত নয়। পিত্তপ্রধান ব্যক্তির পক্ষে খুব উষ্ণদ্রব্য আহার করা একেবারেই অনুচিত।

(১০) আহারের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণাদি জাতির মধ্যে যে স্বল্পজলে গণ্ডুষ করিবার প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা অতি উত্তম ব্যবস্থা। গণ্ডুষ—অগ্নির দীপক। অপরন্তু, আহারের পূর্ব্বে যদি কণ্ঠনালী শুষ্কাবস্থায় থাকে, তবে গণ্ডুষ দ্বারা উহা সিক্ত করিয়া লওয়া যায়। আমাদের দেশে সর্ব্বাগ্রে ঘৃতসিক্ত অন্নগ্রহণের ব্যবস্থা আছে, ইহাও অতি উত্তম প্রথা, —ইহার দ্বারাও শুষ্ক কণ্ঠনালীকে সিক্ত করা যায়। প্রথমেই কঠিন দ্রব্য আহার করা কখনো কর্ত্তব্য নহে।

(১১) ভুক্তবস্তু লালার সহিত ভালরূপ না মিশিলে পরিপাক প্রাপ্ত হয় না, এজন্য বেশ ভাল করিয়া চর্ব্বণ করিয়া আহার করা কর্ত্তব্য। ধীরে ধীরে চর্ব্বণ করিলে ভুক্তদ্রব্যের সহিত লালারস বেশ ভাল করিয়া মিশিয়া থাকে।

(১২) আহারকালে বারংবার জল খাওয়া কর্ত্তব্য নহে। ইহার ফলে খাদ্যদ্রব্য অধিক তরল হওয়ায়, পাচকরস সকল শক্তিহীন হইয়া থাকে। বরফ জল একেবারে বর্জ্জনীয়। আহারের দুই ঘণ্টা পরে জল সেবনীয়। কিন্তু, অত্যন্ত পিপাসার সময় জলপান না করিয়া ভোজন করিলে, গুল্ম রোগ জন্মিতে পারে, অতএব সে ক্ষেত্রে পূর্ব্বে

জলপান করিয়া আহারে বসা উচিত। পক্ষান্তরে, অত্যন্ত ক্ষুধার সময় খাদ্য গ্রহণ না করিয়া জলপান করিলে, জলোদর রোগ জন্মিতে পারে।

(১৩) আহারের স্থান বেশ পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন হওয়া আবশ্যক। দুর্গন্ধ ও ন্যক্কারজনক স্থানে আহার করিলে পরিপাকের ব্যাঘাত ঘটে। স্থানের দোষেই হউক অথবা দ্রব্যের দোষেই হউক, ঘৃণা উপস্থিত হইলে আহার করা কর্ত্তব্য নহে।

(১৪) পাকযন্ত্র সবল রাখিবার জন্য পাকস্থলীর এক তৃতীয়াংশ পূর্ণ হইলে আহার ত্যাগ করা উচিত। রাত্রিকালে উদরপূর্ত্তি করিয়া আহার করা একেবারে কর্ত্তব্য নহে।

(১৫) একরূপ খাদ্য প্রত্যহ খাওয়া উচিত নহে। একই দ্রব্য প্রত্যহ খাইলে অরুচি জন্মিয়া থাকে এবং তাহার ফলে শরীরে রোগ সঞ্চয় সম্ভবপর। পঞ্জিকায় অমুক তিথিতে অমুক দ্রব্য খাইতে নাই বলিয়া যে সকল কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, আমাদের আর্য্যঋষিগণ অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া সে সকল বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সেগুলি মানিয়া চলিলে উপকার ভিন্ন অপকার নাই।

(১৬) হোটেল বা রেষ্টুরাঁগুলিতে আহার করা কোনক্রমেই উচিত নহে; সে সকল স্থানে উচ্ছিষ্ট পাত্রগুলি ভাল করিয়া ধৌত করা হয় না, ফলে ইহার দ্বারা অনেকসময় নানারূপ সংক্রামক রোগ উপস্থিত হইতে পারে। হোটেল বা রেষ্টুরাঁগুলির মত সাধারণ চায়ের দোকানে চা-পান সম্বন্ধেও একই কথা। চায়ের দোকানে চা-পান করিয়া যে সংক্রামক রোগকে ডাকিয়া আনা হইতেছে, সে কথা সরকারী ও স্বাস্থ্যসমিতিগুলির রিপোর্টে স্বীকৃত হইয়াছে। কোন সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাবের সময় ঠাণ্ডা জিনিষ আদৌ খাওয়া উচিত নহে। কোন স্থানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করাও এরূপ সময়ে ঠিক নহে।

(১৭) আহারের পর কি শারীরিক, কি মানসিক—কোনরূপ

পরিশ্রম করাই কর্ত্তব্য নহে, কারণ পাকক্রিয়ার সময় পাকস্থলীতে অধিক পরিমাণে রক্ত সঞ্চারিত হইয়া থাকে। আহারের পর পরিশ্রম করিলে মস্তিষ্ক বা অন্যস্থানে অধিক পরিমাণে রক্ত সঞ্চারিত হওয়ায় সাধারণ রক্ত-সঞ্চালনের ক্ষতি হয়। এজন্য পাকক্রিয়ার হ্রাস ঘটিয়া থাকে। আহারের ঠিক অব্যবহিত পরেই নিদ্রা ও স্নান এই জন্য বর্জ্জনীয়। রাত্রে নিদ্রা যাইবার অন্ততঃ এবং ঘণ্টা পূর্ব্বে আহার করা উচিত।

(১৮) জোর করিয়া কখনো নিজেও খাইতে নাই, কাহাকেও খাইতে অনুরোধ করিতে নাই। আমাদের দেশের অনেক জননী এ কথা বুঝেন না, তাঁহারা অনেক সময় সন্তান-সন্ততিকে বেশী করিয়া খাওয়াইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন; ইহার ফল অনেক সময়ই বিষময় হইয়া থাকে।

(১৯) আহারের কিছুক্ষণ পরে বামপার্শ্বে চাপিয়া অল্পক্ষণ শয়ন করিলে ভুক্তদ্রব্য শীঘ্র পরিপাক হয়।

(২০) ঠিক একই সময়ে আহার করা কর্ত্তব্য। আজ দশটায়, কাল এগারটায়, পরশু বারটায় আহার করা উচিত নহে। ঠিক একই সময়ে পরিমিত ভোজনে আয়ু এবং বলের বৃদ্ধি এবং সময়ের ঠিক না রাখিয়া ও অপরিমিত ভোজনে আয়ুক্ষয় হয় এবং রোগাক্রান্ত হইতে হয় —এই দুইটি কথা সকলেরই জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

(২১) আহারের পর ভাল করিয়া মুখ প্রক্ষালন করা কর্ত্তব্য। এখনকার দিনে অনেকে ইহা মানিতে চাহেন না। নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়া অনেকে গ্লাসের জল দ্বারাই কোনরূপে মুখ প্রক্ষালনের কার্য্য সারিয়া থাকেন। ইহার ফলে মুখগহ্বর ভালরূপে পরিষ্কার হয় না,— ফলে দন্ত-রোগে আক্রান্ত হইতে হয়। দাঁত থাকিতে দাতের মর্য্যাদা আমরা বুঝি না।

(২২) ঘন ঘন ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে; আবার বহু বিলম্বে ভোজন

করিলেও অনিষ্ট হইয়া থাকে, এই জন্য নিজের পরিপাক-শক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আহার গ্রহণের নির্দ্দিষ্ট সময় স্থির করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। বয়স্ক ব্যক্তির মোটমুটি চারিবারের অধিক আহারের প্রয়োজন হয় না। কোন্ দ্রব্য পরিপাক করিতে কত সময় লাগে, সে সম্বন্ধে কতকটা ধারণা থাকা ভাল। আমরা নানারূপ খাদ্য একত্রে আহার করি, সুতরাং পূর্ণ আহারের পাঠ পাকস্থলী শূন্য হইতে ৫।৬ ঘণ্টা লাগে।

আমরা নিম্নে সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য কতিপয় দ্রব্যের পরিপাক-কাল নির্দ্দেশ করিতেছি ঃ—

খাদ্য	পরিপাকের ঘণ্টা	খাদ্য	পরিপাকের ঘণ্টা
ভাত	২	ছাগ, মেষ, হরিণমাংস	৩
		ঐ ভাজা (চপ, কাটলেট)	৪
দাল	৩—৪	গোলআলু ফুলকপি, বাঁধা কপি	৩।৷০
কাঁচা ছোলা, মটর	২৷৷০		
মুগের যূষ	১	ঝিঙ্গে, এঁচোড়, কাঁচকলা পটল ও বেগুন	২৷৷০
খিচুড়ী	৩—৪		
পলান্ন	৫		
পায়সান্ন	৪	মূলা, গাজর	৩
যবের, চিঁড়ার, খইয়ের মণ্ড	১৷৷০—২	ডিম (কাঁচা)	২৷৷০
পুরাতন চালের মণ্ড	১	ঐ অর্দ্ধ সিদ্ধ	৩
সাগু, বার্লি, এরারুট	১—২	ঐ সুসিদ্ধ	৩৷৷০
মুড়ি	১৷০	দুধ (জ্বাল দেওয়া)	২
খই	১।০	ঐ (কাঁচা)	২৷৷০
পাঁউরুটি	৩—৪	ডালিম	১
রুটি	২৷৷০	বাদাম পেস্তা	৪

		আম	২
লুচি, কচুরি	৩৸০	কাঁঠাল	৩
মিছরি, বাতাসা	২	আনারস	২
গুড়, সন্দেশ, চিনি	৩	ঝুনা নারিকেল	৩
অন্যান্য মিঠাই	৩	বেল	২
রোহিত ও অন্যান্য সিদ্ধ মাছ	২॥০	কলা	১৩/৪
ইলিস ও চিংড়ি	৩		
ক্ষুদ্র মাছ	২		

(২৩) অতিরিক্ত মসলাযুক্ত খাদ্য গ্রহণ অবিধেয়। খাদ্য দ্রব্যকে তৃপ্তিকর ও সুস্বাদু করাই মসলার উদ্দেশ্য। মসলাগুলিতে পুষ্টিকর পদার্থ কিছুই নাই, তবে তাহারা উদ্ভিজ্জ জগতের বলিয়া কোন কোনটিতে কিছু কিছু খাদ্যপ্রাণ বিদ্যমান। লঙ্কা অনিষ্টকর তৎপরিবর্ত্তে কাঁচা গোলমরিচও আদা ব্যবহার্য্য।

(২৪) আহারের প্রারম্ভে সৈন্ধব লবণ সহ আদা খাইলে, জিহ্বা ও কণ্ঠশুদ্ধি, আহারে রুচি এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু, গ্রীষ্ম ও শরৎকালে আদা খাওয়া অনুচিত। ভোজনের প্রারম্ভে কদলী ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

(২৫) ভোজনে বসিয়া, প্রথমে সুমিষ্ট ফলাদি সেব্য, কারণ, মধুর রসে পূর্ব্বসঞ্চিত বাতপিত্ত প্রশমিত হয়। তৎপরে, লবণ ও অম্লরস সেব্য, কারণ তাহাতে অগ্নি বৃদ্ধি হয়। অতঃপর, কটু তিক্ত কষায় রস সেবন করিলে কফের নাশ হয় এবং পরিশেষে উষ্ণদ্রব্যাদি ভোজন জন্য যে পিত্তের উৎপত্তি হয়, তাহা মিষ্টান্নাদি মধুর দ্রব্য সেবনে প্রশমিত।

দ্বাদশ অধ্যায়

রন্ধনশালা ও তৈজসপত্র

১। রান্নাঘরকে ঠাকুরঘরেরই মত পবিত্র জ্ঞান করা উচিত। আমরা জুতা পায়ে ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিনা; কিন্তু রান্নাঘরের সম্বন্ধে অনেকেই আজকাল এ নিয়মটুকু মানেন না। জুতার সঙ্গে পথের ধূলা-কাদা আসে, পথের ধূলা-কাদায় অসংখ্য ব্যাধি-বীজাণু বিদ্যমান। সাধ করিয়া সে গুলিকে রান্নাঘরে বহন করিয়া লইয়া যাওয়ার প্রয়োজন কি?

২। বাড়ীর মধ্যে সবচেয়ে স্যাঁতসেঁতে আলো-বাতাসহীন ঘরটিই সাধারণতঃ রান্নাঘর এবং তথায় ধূম নিবারণের যথেষ্ট ব্যবস্থা থাকে না। বোধ হয় এই কারণেই সহর অঞ্চলে গৃহস্থনারীর মধ্যে আজকাল যক্ষ্মা রোগের প্রাবল্য। আজকাল কলিকাতায় কোন কোন বাড়ীতে গৃহের সর্ব্বোচ্চ তলে রান্না ঘরের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। বসতি-বহুল স্থানের পক্ষে এ প্রথাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

৩। রান্নাঘরের সন্নিকটে উন্মুক্ত পয়ঃপ্রণালী থাকা উচিত নয়। পল্লীগ্রামে রান্নাঘরের সন্নিকটেই ফেন ফেলার গর্ত্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ফেন ফেলা যে উচিত নয়, এ কথা পল্লীবাসী যে দিন বুঝিবেন, সে দিন ঐ অস্বাস্থ্যকর প্রথা উঠিয়া যাইবে, আশা করা যায়।

৪। খাদ্যদ্রব্যে যাহাতে মাছি ও অন্যান্য কীটপতঙ্গ কোনক্রমে বসিতে না পারে, সে জন্য সর্ব্বদা তরিতরকারী, মাছ-মাংস ঢাকিয়া রাখা উচিত। আঢাকা দুধ সহজেই বায়ু হইতে বীজাণু আকর্ষণ করে। মাটিতে আঢাকা অবস্থায় কোন খাদ্যদ্রব্যই রাখা উচিত নয়।

৫। পাচক-পাচিকা সম্পূর্ণ নীরোগ অবস্থায়, শুচিভাবে, পরিষ্কৃত বস্ত্র পরিধান করিয়া রন্ধন করিবেন এবং কোন প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন হস্তদ্বারা স্পর্শ না করিয়া হাতা বা চামচ সাহায্যে পরিবেশন করিবেন। অন্ন-ব্যঞ্জন হাতে করিয়া ঘাঁটিলে শীঘ্রই বিস্বাদ হইয়া যায়।

৬। শাকসব্জি, মাছ, মাংস, চাল, ডাল প্রভৃতি বিশুদ্ধ পানীয় জলে ধৌত করিয়া ব্যবহার করা উচিত। শাকাদি যথেষ্ট যত্নসহকারে না ধুইলে, অনেক দূষিত পদার্থ উহার মধ্যে থাকিয়া যায়।

৭। শাকসব্জির খোলা ও অন্যান্য আবর্জ্জনা যথাসম্ভব সত্বর রান্নাঘর হইতে দূরীভূত করিলে, মাছি ও অন্যান্য কীটের উপদ্রব কমিয়া যাইবে।

৮। সর্ব্বদা বিশুদ্ধ পানযোগ্য জলে ধৌত বাসন ব্যবহার করা উচিত। আজকাল এলুমিনিয়মের বাসনের খুব প্রচলন হইয়াছে; এলুমিনিয়মের দ্রব্যে ঘৃত ও তৈলময় খাদ্য বহুক্ষণ থাকিলে সময় সময় বিষাক্ত হইয়া উঠে। কলাইকরা তামার রন্ধনপাত্রের কলাই উঠিয়া যাওয়াতে অনেক ক্ষেত্রে ফল বিষময় হইয়াছে। আমরা কলাই করা তামার রন্ধন পাত্র ব্যবহার করার আদৌ পক্ষপাতী নহি। এনামেল করা পাত্রের "চটা" উঠিয়া গেলে ভাল পরিষ্কার হয় না, সুতরাং ঐরূপ "চটা" উঠা এনামেল পাত্র পরিত্যাজ্য। মাটির হাঁড়িতে প্রস্তুত অন্নই প্রশস্ত।

৯। আমাদের বাসনমাজা-প্রথা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা দরকার। পল্লীগ্রামে পুকুরের যে ঘাটে স্নান ও শৌচ করা হয়, সেই ঘাটেরই পাঁক মাটিতে সাধারণতঃ বাসন মাজা হয়। সহরের লোক ধুলা, মাটি, পচা খইল, গোবর, যখন যা, হাতের কাছে পায়, তাই দিয়া বাসন মাজে। আমাদের মধ্যে যে যে কারণে সংক্রামক ব্যাধি-গুলি এত সহজে ছড়াইয়া পড়ে, বাসন মাজার অসাবধানতা তাহার

একটি কারণ। বাসন মাজার পক্ষে উনানের ছাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত, অথচ এ জিনিষ সহজলভ্য। প্রায়ই দেখিতে পাই, কলিকাতার ঝিয়েরা কলে উচ্ছিষ্ট বাসন ধুইবার সময়, একটা মান্ধাতার আমলের পুরাতন, অতি মলিন ন্যাতা ব্যবহার করে। বাসন ধুইতে এ ন্যাতা ব্যবহারের কি প্রয়োজন হয়, তাহা বুঝি না। প্রত্যেক বাসনই ব্যবহার করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে আর একবার বিশুদ্ধ জলে ধুইয়া লওয়া উচিত।

১০। আমাদের রান্নাঘরে গোময়ের অবাধ রাজত্ব স্মরণাতীত কাল হইতে চলিতেছে দেখিয়া, অনেকেই গোময়ের ব্যাধিবিনাশক শক্তি সম্বন্ধে দার্শনিক তথ্য শুনাইয়া থাকেন। কিন্তু, গাভীর প্রতি যতই ভক্তি থাক, জিনিষটা যে আদৌ প্রীতিপদ নহে, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। অতএব, এতটা উৎকট গোময়-প্রীতির কারণ কি ?—অধিকন্তু, অনেক ক্ষেত্রে গোবর পূর্ব্ব হইতে সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হয় ; এজন্য ইহা স্বভাবতই পচিয়া উঠে এবং সেই পচা বিষ্ঠা চুল্লাতে এবং রান্নাঘরে লেপন করিয়া আমরা শুচিতা রক্ষা করি। ইহার উপরে, যদি গরু কোন ব্যাধিগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে ত কথাই নাই। টাট্‌কা গোবরেও যে মাছি ও কীটাদি আকৃষ্ট হয়, ইহা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন। যদি শুদ্ধি ও শুচিতা রক্ষা করাই গোময় লেপনের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আমরা বলিব,—বিশুদ্ধ জলই সে কার্য্যের পক্ষে যথেষ্ট, তবে মধ্যে মধ্যে ঐ জলে কিছু চূণ মিশাইয়া লওয়া উচিত। অবশ্য রান্নাঘরের কক্ষতল যদি মৃত্তিকা নির্ম্মিত হয়, তাহা হইলে উহার দৃঢ়তা সম্পাদন জন্য, গোবর ব্যবহার করা দরকার হয় বটে, কিন্তু সেক্ষেত্রেও ব্যাধিশূন্য গরুর টাট্‌কা গোবর ব্যবহার করা উচিত ; তবে প্রত্যহ নয় এবং কক্ষতল সম্পূর্ণ শুষ্ক না হইলে কক্ষটি ব্যবহার করা অকর্ত্তব্য।

রন্ধনশালার রীতিনীতি, রন্ধনবিধি ও তৈজসপত্রাদির পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে অনেকেই জ্ঞানপাপী। আলস্য ও ঔদাস্যই ইহার কারণ। ঐ আলস্য এবং ঔদাস্যের ফলে, পরিণামে আমাদের কতটা ক্ষতি-স্বীকার করিতে হয়, এ কথা সকলে, বিশেষ করিয়া পুরমহিলারা, যে দিন বুঝিবেন, সে দিন জাতির স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে। জার্ম্মানীতে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের উপযোগী আদর্শ রন্ধনশালা গড়িয়া, মেয়েদের এ সব বিষয়ে যথোচিত শিক্ষা দেওয়া হয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শিশু-খাদ্য

শিশুখাদ্যের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে, তিনটি বিষয় নজরে পড়ে। ধনী ও মধ্যবিত্তের সংসারে অতিভোজন (overfeeding) কিম্বা অহিতভোজন (wrong feeding) এবং অভাবের সংসারে, খাদ্যের অপ্রাচুর্য্য (underfeeding)। এই তিনটিই সমান দোষাবহ।

জন্মকালে শিশুদের পাকস্থলীর গ্রহণশক্তি (capacity) এক-কালীন প্রায় এক আউন্স। এই গ্রহণ-শক্তি (capacity) মাস বৃদ্ধির সহিত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়া, তিনমাসে প্রায় এককালীন ৪॥০ আউন্স, ছয় মাসে এককালীন প্রায় ৬ আউন্স এবং বারো মাসে এককালীন ৯ আউন্স দাঁড়ায়।

১। দুধ

মাতৃস্তন্যের পরেই, দুধ শিশুর পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খাদ্য। কিন্তু নানাকারণে একদিকে খাঁটি দুধ যেমন দুর্লভ, অন্যদিকে যেমনতেমন

দুধই হউক—উহার দাম নিত্যই বাড়িয়া চলিয়াছে। খাদ্য-সমস্যার কোন সমাধান করা এ পুস্তকের উদ্দেশ্য না হইলেও, আমরা বলিতে বাধ্য যে, দুধের চাহিদা যতটা বাড়িয়া গিয়াছে, ততটা খাঁটি দুধ যোগান দেওয়া বর্ত্তমানে অসম্ভব। যতদিন না সমর্থ গৃহস্থ আবার গো-পালনে মনোযোগী হইতেছেন, ততদিন এ সমস্যার সমাধান হইবে না। অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে বলিতে হয় যে, যেখানে শিশু ও রোগী এবং সন্তানসম্ভবা নারী ও দুগ্ধপোষ্য শিশুর জননী পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দুধ পায় না, সেখানে কোন বয়স্ক ব্যক্তির দুগ্ধপানে অধিকার নাই। আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় কোন প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, লণ্ডনে ও প্যারিসে কলিকাতার চেয়ে দুধ দামে সস্তা, অথচ একেবারে নির্জ্জলা! মনে রাখিতে হইবে, ও দেশে দুধ প্রধানতঃ শিশুর খাদ্য এবং রোগীর পথ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। কাজেই সেখানে দুধের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে অস্বাভাবিক বৈষম্য নাই। আর তা' ছাড়া, ঐ সকল জাতি গো-পূজক হিন্দুর চেয়েও অধিক পরিমাণে গো-পালনে এবং গো-সেবায় তৎপর।

যাহা হউক, এক হইতে পঞ্চম বর্ষ বয়স্ক শিশুর প্রত্যহ অন্ততঃ একসের খাঁটি গো-দুগ্ধ বা ছাগদুগ্ধ দরকার হয়। ছাগ পালনের ব্যয় অতি অল্প, পল্লীগ্রামে কোন খরচ নাই বলিলেই চলে। অথচ, সহরে ছাগদুগ্ধের দাম অত্যন্ত বেশী এবং ছাগদুগ্ধের ব্যবসায়টা পশ্চিমাদের হস্তগত। অনেক বাঙ্গালী-গৃহস্থ ছাগ-পালনে সক্ষম কিন্তু একটা অন্ধ সংস্কারের বশে করেন না। জানিয়া রাখা ভাল—ছাগদুগ্ধ মুখঢাকা পাত্রে রাখিয়া, জলপূর্ণ কড়ায় বসাইয়া, জ্বাল দিলে সমধিক গুণশালী হয় এবং ছাগ-দুগ্ধ জ্বাল দিবার রীতিই এই।

যে সকল গরু চরিতে পায় এবং তাজা ঘাস খায়, তাহাদের দুধে "ক" ভাইটামিন্ প্রচুর পরিমাণে থাকে এবং গাভীর দুধে "খ"

ভাইটামিনও আছে। এতদ্ব্যতীত, কিয়ৎপরিমাণে ফস্‌ফরাস্ ও ক্যালসিয়াম গরুর দুধে বিদ্যমান। এজন্য, গাভীর দুগ্ধ পানে শিশুদের অস্থি এবং দন্তের দৃঢ়তা ও বৃদ্ধির সহায়তা হয়। জ্বাল দেওয়া গরুর দুধে "গ" ভাইটামিন্ থাকে না। আমাদের দেশে, নানা কারণে, শিশুকে কাঁচা দুধ খাওয়ানো উচিত নয়। এস্থলে, জ্বাল দেওয়া দুধে "গ" ভাইটামিনের অভাবজনিত এই ক্ষতি, টাট্‌কা সব্জী বা ফলের রস পান করাইয়া, পূরণ করিতে হয়। সুপক্ব বিলাতী বেগুনের টাট্‌কা কাঁচা রস এক্ষেত্রে উত্তম খাদ্য। অধিকন্তু, জ্বাল দেওয়া দুধে "ঘ" ভাইটামিন্ বিনষ্ট হয়। "ঘ" ভাইটামিনের এই অভাব পূর্ণ করিতে হইলে, শিশুকে উপযুক্ত পরিমাণে রৌদ্র সেবন করান কর্ত্তব্য ; কারণ, সূর্য্য কিরণের দ্বারা "ঘ" ভাইটামিনের অভাবজনিত ক্ষতি পূর্ণ হয়।

আজকাল, কলিকাতা এবং অন্যান্য বড় সহরে, গাভী দুগ্ধের নামে, বহুল পরিমাণে মহিষ দুগ্ধ, বিক্রেতারা চালাইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এ ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা—মহিষ দুগ্ধে প্রচুর জল মিশাইয়া থাকে। গাভী দুগ্ধ অপেক্ষা মহিষদুগ্ধে অধিক পরিমাণে প্রোটীন এবং প্রায় দ্বিগুণ ফ্যাট্ বিদ্যমান। সুতরাং, শিশুগণের পক্ষে মহিষদুগ্ধ পরিপাক করা শক্ত।

ছাগীদুগ্ধে গাভীর দুগ্ধ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রোটীন্ আছে এবং ছাগী দুগ্ধে "ক" ও "ঘ" ভাইটামিন্ গাভীদুগ্ধ অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে আছে। শিশুদের পক্ষে ইহা উত্তম খাদ্য।

দুধে নানা প্রকার রোগের বিষাক্ত জীবাণু অতি সহজেই আকৃষ্ট এবং বর্দ্ধিত হয়। এই দোষেই অধিকাংশ শিশুর কলেরা, টাইফয়েড উদরাময় এবং পাকস্থলীর প্রদাহ জন্মিয়া থাকে। জ্বাল দিলে, দুধের মধ্যস্থ বিষাক্ত বীজাণু ধ্বংস প্রাপ্ত হয় বটে, তথাপি গোয়ালঘর, দুধের পাত্র ও দুধের বিশুদ্ধতা ও নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে সকলেরই অবহিত হওয়া উচিত।

ঘোল শিশুদের উপযুক্ত পরিমাণে দেওয়া চলিতে পারে। কিন্তু, যে দুধ হইতে ঘোল প্রস্তুত করা হইবে, তাহার সর্ব্বাংশে বিশুদ্ধতা বাঞ্ছনীয়। ঘোল দুধ অপেক্ষা সহজে হজম হয় এবং ঘোল সেবনে শারীরিক পুষ্টি ও দীর্ঘজীবন লাভ হয়।

(২) অন্যান্য দ্রব্য

(ক) একবৎসর বয়স পূর্ণ হইলে শিশুকে স্তন্যপান করানো উচিত নয়। স্বচ্ছল সংসারে শিশুকে অধিক দিন পর্য্যন্ত গাভীর দুধ খাওয়াইয়া রাখা হয়। অনেক জননী মনে করেন, শিশুকে অল্পবয়স হইতে ভাত খাইতে অভ্যস্ত করাইলে, উহাদের 'ভেতো' চেহারা হয়, পেট মোটা হয়, ইত্যাদি। ইহা অতি ভ্রান্ত ধারণা। অধিক পরিমাণে না খাইলে কিছুতেই পেট মোটা হয় না। দরিদ্রের শিশু অল্প বয়স হইতে কেন ভাত খাইয়া যথেষ্ট বল সঞ্চয় করে; আর এই সব ভদ্রসম্প্রদায়ের শিশুদের মধ্যেই যকৃতের পীড়া বেশী দেখা যায়। এক বৎসরের অধিক বয়স্ক শিশুকে ধীরে ধীরে দুগ্ধ ভিন্ন অল্প পরিমাণে ভাত খাওয়া অভ্যাস করানো উচিত। প্রথম হইতেই পুরাতন আতপ চাউলের ভাত অভ্যাস করাইয়া দিলে উপকার আছে, অথচ অজীর্ণের আশঙ্কা নাই।

(খ) তিনবৎসর হইতে শিশুকে প্রত্যহ কিছু কিছু শাকসব্জী খাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য। শিশু সহজে তরকারী খাইতে চাহে না, তরকারীর মধ্যে আলুটাই স্বেচ্ছায় খাইয়া থাকে। বেশী আলু খাওয়ার দরুণ অনেক শিশুর অনাবশ্যক মেদবৃদ্ধি হয়। যতদিন না ভাল করিয়া চিবাইতে শেখে, ততদিন পর্য্যন্ত শাকসব্জির সুরুয়া তৈয়ারী করিয়া দেওয়া উচিত। মাংসের যে ভাবে সুপ্ বা সুরুয়া প্রস্তুত হয়, সেই ভাবে আস্ত শাক-সব্জিকে ছোট ছোট খণ্ড করিয়া অত্যল্প মসলা

সংযোগে সিদ্ধ করতঃ, সিদ্ধ সব্জিগুলি চট্‌কাইয়া কাথটুকু ছাঁকিয়া লইতে হইবে। শিশু চিবাইয়া খাইতে শিখিলে, ছাঁকিবার প্রয়োজন নাই, তবে শিশু যাহাতে ঐ সব্জিগুলি ভাল করিয়া চিবাইয়া ছিব্‌ড়াগুলি ফেলিয়া দেয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিলেই হইল। প্রসিদ্ধ খাদ্যতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার রমেশ চন্দ্র রায় বলেন, ফেনের সহিত উক্ত প্রকারে সব্জি সংযোগ করিয়া ঝোল প্রস্তুত করিয়া দিলে, বেশ পুষ্টিকর শিশুখাদ্য প্রস্তুত হয়, অথবা ফেনের সহিত লবণ, লেবুর রস কিম্বা অল্প গুড় সংযোগ করিয়া শিশুদিগকে খাইতে দেওয়া উচিত।

(গ) ছোট ছোট মাছ বা মাছের ঝোল দেওয়া চলিতে পারে। এ বয়সে মাংস না দেওয়াই ভাল। কাঁচা ডিমের কুসুমটুকু মধ্যে মধ্যে দিলে উপকার আছে। পাঁচ বৎসর বয়স হইতে মাংস, ঘৃতাক্ত দ্রব্যাদি দেওয়া চলে। এই সময় হইতে শিশুর ক্রমবর্দ্ধনশীল দেহের জন্য ফ্যাট্ জাতীয় খাদ্য প্রয়োজন। কিন্তু পরিমাণে অধিক হইলে, উদরাময় হয়। মোট কথা, এই সময় হইতে দৈনিক খাদ্যের মধ্যে যাহাতে কিছু কিছু ফ্যাট্ জাতীয় খাদ্য থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(ঘ) প্রত্যহ কিয়ৎপরিমাণে সময়ের টাট্‌কা ফল বা ফলের রস, অভাবে কাগজি বা পাতিলেবুর রস—গুড় সহযোগে দেওয়া কর্ত্তব্য। যাহারা চিবাইয়া খাইতে শিখিয়াছে, তাহাদিগকে ইক্ষু প্রভৃতি দাঁতে ছাড়াইয়া খাইতে দেওয়া উচিত। মনে রাখিতে হইবে, প্রত্যহ কিছু কিছু শক্ত জিনিষ দাঁতে চর্ব্বণ করিয়া খাইলে, দাঁত শক্ত হয় এবং চিরকাল ভাল থাকে। শিশুরা বাদাম, চীনাবাদাম, ছোলা, মটর প্রভৃতি জিনিষ প্রাকৃতিক প্রেরণাতেই ভালবাসে।

(ঙ) শিশুর জলখাবার হিসাবে অনেক পুষ্টিকর সাধারণ জিনিষ সস্তায় পাওয়া যায়। আমরা সেগুলিকে হয় অবহেলা করি, নয় স্বাস্থ্য-নাশের ভয়ে দিই না। এই ভয় অমূলক, মাত্রার দিকে লক্ষ্য রাখিলে

ভয়ের কোনও কারণ নাই। আঙ্গুর. আপেল, ন্যাসপাতি, বেদানা, কিস্‌মিস্, মনাক্কা, আখ্‌রোট, খোবানি, খেজুর প্রভৃতি মহার্ঘ ফল নাই জুটুক, শশা, কলা, বিলাতি বেগুন, কাঁচাপিঁয়াজ, জাম, জামরুল, মিষ্ট কুল, পিয়ারা, ফুটি, তরমুজ, আনারস, পেঁপে, আম, কাঁঠাল, আক, যখন যাহা জুটিবে, তাহাই নির্ভয়ে শিশুদিগকে দেওয়া যাইতে পারে। বাজারের খাবার বিষবৎ পরিত্যাজ্য। তৎপরিবর্ত্তে মুড়, মুড়কি, চিঁড়া, খই, ছোলাসিদ্ধ, কলাইশুঁটি (কাঁচা বা সিদ্ধ) অঙ্কুরিত ছোলা, ভিজা মুগ, চীনাবাদাম, মটর প্রভৃতি; ঘরে প্রস্তুত ছোলার চাক, মুড়ির চাক, চিঁড়ার চাক, মোহনভোগ ইত্যাদি শিশুদিগের উত্তম জলখাবার।

(৭) চিনি—শিশুদের উপযোগী নয়। চিনি সেবনে উহাদের অনিষ্ট হয়, চিনির পরিবর্ত্তে গুড় দেওয়া উচিত। চিনিতে ভাইটামিন নাই। তাই বলিয়া দুধের সহিত গুড় মিশাইয়া খাইতে দিবেন না। বস্তুত, দুধের সহিত গুড় খাইলে অজীর্ণ ও অম্ল হয়।

(৩) অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়

(ক) শিশুর দাঁত যাহাতে পরিষ্কার থাকে—তাহার দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। শক্ত জিনিষ না খাইলে দাঁত ও মাড়ী শক্ত হয় না।

(খ) প্রত্যেকবার খাইবার পূর্ব্বে শিশু যাহাতে হাত ধুইতে শেখে, সেই অভ্যাস করান উচিত। সাধারণতঃ শিশু খাইবার পূর্ব্বে হাত ধোয় না।

(গ) নিজেরা খাইতে বসিলেই, শিশুর মুখে যখন তখন কিছু খাদ্যাংশ তুলিয়া দেওয়া উচিত নয়। ইহাতে স্নেহের নামে, অজ্ঞাতসারে তাহাদের ক্ষুদ্র পাকস্থলীর উপর অত্যাচার করা হয়।

(ঘ) স্তন্যপায়ী শিশুকে সাধারণতঃ প্রায় পনেরো মিনিট স্তন্য পান করাইলেই, তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়। প্রায়শঃ এক স্তনের দুধই একবারের পক্ষে যথেষ্ট। যদি স্তনে দুগ্ধ না থাকে, তাহা হইলে অবশ্য প্রতিবারেই দুই স্তনের দুধই আবশ্যক হয়। শিশু সূতিকাঘর হইতেই যাহাতে রাত্রি দশটার পর কিছু না খায়, সে অভ্যাস করানো উচিত। আমরা দেখিয়াছি, সূতিকাগারে যদি প্রথম হইতেই রাত্রি দশটার পর শিশুকে স্তন্যদান না করা যায়, তাহা হইলে প্রথম দুই একটা দিন শিশু কাঁদে বটে, কিন্তু তৎপরেই তাহার অভ্যাস হইয়া যায় এবং অকাতরে নিদ্রা যায়। ইহাতে শিশুর কোনই ক্ষতি হয় না। ইহা নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক নহে, পরন্তু, শিশুর পক্ষেও মঙ্গলজনক, জননীর পক্ষেও আরামদায়ক।

(ঙ) শিশুর আহারের এবং জলযোগের সময় নির্দ্দিষ্ট থাকা উচিত।

(চ) প্রত্যহ যাহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত এবং প্রত্যহ প্রাতে শয্যাত্যাগের পর বড় শিশু যাহাতে মল-ত্যাগের চেষ্টা করে, সে অভ্যাস করানো ভাল।

(ছ) প্রত্যহ সকালে এবং বৈকালে রৌদ্র সেবন শিশুদেহের পক্ষে আহারেরই মত প্রয়োজনীয় এবং ফলপ্রদ। তবে বাড়াবাড়ি ভাল নয়। গ্রীষ্মের রৌদ্র বায়ুবর্দ্ধক এবং শরতের রৌদ্র পিত্তকর। তবে উদীয়মান সূর্য্যের কিরণ সকল সময়েই হিতকর, কিন্তু, অত সকালে শিশুর দেহে উপযুক্ত আচ্ছাদন থাকা দরকার। খোলা বাতাসে রৌদ্র সেবন করিলে খাদ্যে ভিটামিন "ডি"র অভাব সূর্য্যকিরণের দ্বারা পূর্ণ হইয়া থাকে।

(জ) বিস্কুট, কেক, চকোলেট, পুডিং, চাটনি, সিরাপ প্রভৃতি অধুনাপ্রচলিত খাদ্য শিশুদের পক্ষে অহিতকর।

(ঝ) শিশুদের মিশ্র অথবা সর্ব্ববিধ রসের খাদ্য খাইতে অভ্যাস

করান উচিত।—নতুবা কোন একরূপ বিশেষ খাদ্যের উপর ঝোঁক দাঁড়াইয়া গেলে, পরবর্ত্তী জীবনে কষ্ট এবং রোগ—দুইই ভোগ হয়। শৈশব হইতে মিষ্টদ্রব্যের প্রতি ঝোঁক হইয়া যাওয়াতে, অনেকে পরিণত বয়সে ভোগেন।

(ঞ) যদি প্রথম হইতেই খাদ্য সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া যায় এবং শিশুর যদি সাধারণ স্বাস্থ্য খারাপ না হয়, তাহা হইলে তিন বৎসর বয়সে তাহার প্রায় সর্ব্ববিধ খাদ্য পরিপাক করিবার শক্তি বিকাশ পায়। কিন্তু শিশুর খাদ্যের পরিমাণ সম্বন্ধে বাঁধাধরা কিছু বলা যায় না। পরিমাণ অনেকাংশে ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও পরিপাকশক্তির উপর নির্ভর করে।

(ট) যে সকল শিশুকে বোতলে দুধ খাওয়ান হয়, তাহাদের দুধের বোতল যাহাতে সর্ব্বদা পরিষ্কার থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। অধিকন্তু, সে সকল শিশুকে প্রত্যহ টাট্‌কা সুমিষ্ট ফলের রস খাইতে দিতে হয়। প্রথমে এক চামচ মাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে মাত্রা বাড়াইবে।

(ঠ) স্তনদুগ্ধ ছোট শিশুদের যে আদর্শ খাদ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, স্তনদুগ্ধের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ নির্ভর করে স্তন্যদায়িনীর খাদ্যের গুণাগুণের উপর। আমরা ভাইটামিন্ অধ্যায়ে বলিয়াছি যে, মাতার খাদ্যে 'ক' ভাইটামিনের অপ্রাচুর্য্য থাকিলে, স্তনদুগ্ধে ভাইটামিন্ 'ক' এর মাত্রা কমিয়া যাইবে এবং 'খ' ভাইটামিন্ যথেষ্ট না থাকিলে, মাতার দুগ্ধ কমিয়া যাইবে। যে সকল জননী তাজা শাকসব্‌জি বা ফল খান না, অথবা যাঁহারা সাধারণতঃ চিক্কণ চাউল ও সাদা ময়দা খান, তাঁহাদের স্তনদুগ্ধে 'ক' ও 'খ' ভাইটামিন্ কম হইবে। স্তন্যপায়ী শিশুদের মধ্যেও যে বেরি বেরি রোগ হইতে দেখা যায়, তাহার প্রধান কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া

আমরা দেখিয়াছি যে, সে সকল ক্ষেত্রে শিশুর মাতা প্রধানতঃ কলের ছাঁটা চাউলের ভাত খান। মাতার যদি যক্ষ্মা প্রভৃতি কোন দুরন্ত ব্যাধি থাকে, তাহা হইলে শিশুকে মাতৃস্তন্যের পরিবর্ত্তে অপর কোন নীরোগ ধাত্রীর স্তন্য অথবা গাভীদুগ্ধ পান করাইতে হইবে। শিশুর জন্মের পূর্ব্বে মাতার শরীরে উপদংশ বিষ প্রবেশ করিয়া থাকিলে, সে মাতার স্তন্যপানে শিশুর কোনো ক্ষতি হইবে না, কারণ, উক্ত রোগবীজ শিশুর শরীরেও বর্ত্তমান। অন্যত্র, ধাত্রীর স্তন্য পান করাইতে হইলে, ধাত্রীর অনুরূপ কোন পীড়া থাকিলে, শিশুকে তাহার স্তন্য পান করিতে দেওয়া কদাচ উচিত নহে।

(ঙ) দুগ্ধপোষ্য শিশুর খাদ্য, যদি শিশুর উপযোগী না হয়, তাহা হইলে শীঘ্রই তাহার শরীরে কোন না কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। শিশুর দুধে প্রোটীন্ কম হইলে, তাহার ওজন কমিয়া যায় এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রোটীন্ হইলে কোষ্ঠকাঠিন্য ও পেটে বেদনা জন্মিতে পারে। মলের সহিত অপরিপক্ব ছানাকাটা দুধের মত দেখা গেলে, বুঝিতে হইবে, দুধ বেশী ঘন খাওয়ানো হইয়াছে। সে ক্ষেত্রে, দুধে কিছু জল মিশাইয়া, আরও পাত্‌লা করিয়া দেওয়া দরকার।

(চ) বয়োবৃদ্ধির সহিত শিশুর ওজনের স্বাভাবিক বৃদ্ধি হওয়া প্রয়োজন। খাদ্যে শালিজাতীয় উপাদান (শ্বেতসার), প্রয়োজন অপেক্ষা কম হইলে, এই স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যহত হয়। পক্ষান্তরে, শ্বেতসার উপাদান প্রয়োজনের অতিরিক্ত হইলে, উদরাময় পেটফাঁপা ও পেটে বেদনা দেখা দেয়। ফ্যাট্ বা স্নেহজাতীয় বস্তু যথা, ঘৃত, তৈল প্রভৃতি প্রয়োজনের অপেক্ষা কম হইলে, মল কঠিন এবং শুষ্ক হয় এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত হইলে, বমন, ভেদ প্রভৃতি হয়।

(ণ) ছোট শিশুর দুধের তালিকা—

বয়স	দুধ	জল	পরিমাণ	সময়ের ব্যবধান
১ সপ্তাহ—	১ ভাগ—	২ ভাগ—	½ ছটাক—	৩-৪ ঘণ্টা
১ মাস—	২ ভাগ—	৩ ভাগ—	১ ছটাক—	৪ ঘণ্টা
৩ মাস—	১ ভাগ—	১ ভাগ—	½ পোয়া—	৪ ঘণ্টা
৬ মাস—	৩ ভাগ—	১ ভাগ—	১ পোয়া—	৪ ঘণ্টা

(ত) তিন হইতে পাঁচ বৎসরের ছেলের উপযুক্ত মোট দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ ঃ—চাউল— ½ ছটাক, দাল ½ ছটাক। আলু—১ ছটাক। অন্যান্য তরকারী—১ ছটাক। দুধ— ৩ পোয়া। কাঁচা ডিম— ১টা। গুড়—½ ছটাক। চিঁড়া বা মুড়ি—¼ ছটাক। যে কোন ফল উপযুক্ত পরিমাণে।

(থ) ছয় বৎসরের ছেলের উপযুক্ত মোট দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ। চাউল—১ ছটাক। দাল—১½ ছটাক। মাছ বা মাংস—১ ছটাক। ডিম—১টা। ঘৃত—¼ ছটাক। আলু—½ ছটাক। অন্য তরকারী—১½ ছটাক। আটা—১ ছটাক। গুড়—½ ছটাক। চিঁড়া বা মুড়ি—½ ছটাক। যে কোন ফল উপযুক্ত পরিমাণে।

(দ) এক হইতে পঞ্চম বৎসর বয়স্ক শিশুর বয়স ও উচ্চতা অনুসারে গড় ওজন ঃ—

	বালক		বালিকা	
বয়স বৎসর	উচ্চতা ইঞ্চি হিসাবে	ওজন পাউণ্ড হিসাবে	উচ্চতা ইঞ্চি হিসাবে	পাউণ্ড হিসাবে ওজন
১	৩০	২২	২৯	২১
২	৩৩·৫	২৭	৩২·৫	২৬
৩	৩৭	৩২	৩৫·৫	৩১
৪	৩৯	৩৬	৩৮	৩৫
৫	৪১·৫	৪১	৪১	৪০
৬	৪৪	৪৫	৪৩·২৫	৪৩·২৫

(খ) জন্মকাল হইতে ১ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুর গড় ওজন ঃ—

১ম সপ্তাহ—৬-৬½ পাউণ্ড। ২য় সপ্তাহ—৬-৭½ পাঃ। ৩য় ও ৪র্থ সপ্তাহ—৭½-৮½ পাঃ। ২ মাস—১০ পাঃ। ৩ মাস—১১ পাঃ। ৪ মাস—১২ পাঃ। ৫ মাস—১৩½ পাঃ। ৬ মাস—১৫ পাঃ। ৭ মাস—১৬ পাঃ। ৮ মাস—১৭ পাঃ। ৯ মাস—১৮ পাঃ। ১০ মাস—১৯ পাঃ। ১১ মাস—২০ পাঃ। ১২ মাস—২১ পাউণ্ড।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

পরিপাক-প্রণালী

মানব দেহে পরিপাক সম্বন্ধীয় যে সকল যন্ত্র আছে, তাহাদের কার্য্য ভুক্তদ্রব্যের পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া রক্ত মাংস প্রভৃতিতে পরিণত করা। খাদ্যদ্রব্য উদরস্থ হইয়া পরিবর্ত্তিত হওয়ার নাম—পরিপাক-প্রণালী।

পরিপাক করিবার জন্য শরীরের কোন্ কোন্ যন্ত্রগুলিতে কি কি বিশেষ কাজ হয় এবং পরিপাক-ক্রিয়া কিরূপভাবে সাধিত হইয়া থাকে, তাহা সংক্ষেপে জানা সকলেরই আবশ্যক।

জিহ্বা ও দন্তের কার্য্য—দন্তের কার্য্য খাদ্যবস্তু চিবাইয়া পরিপাকের উপযোগী করিয়া দেওয়া। জিহ্বা খাদ্যের অংশগুলিকে দন্তের নীচে সরাইয়া দিতে সাহায্য করিয়া থাকে।

লালারসের প্রয়োজনীয়তা—মুখগহ্বরের মধ্যে কতকগুলি থলি বা গ্রন্থি আছে। গ্রন্থিগুলির ভিতর হইতে চর্ব্বণ কালে লালা নিঃসৃত হইয়া থাকে। খাদ্যদ্রব্য চর্ব্বণের ফলে, লালার সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া নরম হয়। এই লালারস একটু জারক, অর্থাৎ, খাদ্যবস্তু জীর্ণ করিতে কিছু সহায়তা করিয়া থাকে। অনেকের ধারণা ভাত, আলু প্রভৃতি কোমল জিনিষ বেশী চর্ব্বণ করা নিষ্প্রয়োজন। এ ধারণা ভুল; ভাত, আলু প্রভৃতির শ্বেতসার ভাগ, এই লালারসেরই সাহায্যে প্রথমতঃ উত্তমরূপে দ্রবীভূত হইলে, তবেই প্রয়োজনীয় শর্করায় পরিণত হয়। ফলতঃ, সকল খাদ্যদ্রব্যই বেশ করিয়া চর্ব্বণ করা প্রয়োজন, যতই চর্ব্বণ করা যাইবে—ততই খাদ্যের সঙ্গে লালা ভালভাবে মিশ্রিত হইবে ও উপযুক্তরূপ চর্ব্বণ করা হইলে, উহা সহজেই গলাধঃকরণ হইবে। খুব ভালভাবে চর্ব্বণ না করিলে, বা যাঁহাদের দাঁত পড়িয়া যাওয়ায় ভাল করিয়া চর্ব্বণ করিয়া খাইতে পারেন না, তাঁহাদের খাদ্য সম্যক্ পরিপাক হয় না এবং পরিণামে অজীর্ণ রোগ জন্মায়। যাঁহাদের দন্ত পড়িয়া গিয়াছে, তাঁহারা দন্ত বাঁধাইয়া লইলে, অজীর্ণ রোগ হইবার সম্ভাবনা কম।

চর্ব্বিত ও লালামিশ্রিত খাদ্য পিণ্ডাকারে পরিণত হইয়া গলগহ্বরে (Pharynx) প্রথমে প্রবেশ করে ও তথা হইতে অন্ননালী (Œsophagus) দিয়া পাকস্থলীতে প্রবিষ্ট হয়।

পাকস্থলীর কার্য্য—পরিপাক-কার্য্যে পাকস্থলীর দুইটী প্রধান ক্রিয়া। (১) পাচক রস নিঃসরণ (Gastric juice) (২) 'নাড়াচাড়া' গতি (Peristaltic movements of the Stomach)—এই দুই ক্রিয়া দ্বারা আংশিকভাবে পাকস্থলীতে পরিপাকক্রিয়া সম্পাদিত হয়।

পাকস্থলী কোমল পেশী তন্তু দ্বারা গঠিত একটী দুই মুখযুক্ত থলি বিশেষ। উক্ত স্থলীতে খাদ্যদ্রব্য প্রবেশ করিলে, অবরোধক পেশী সঙ্কোচন জন্য, নিম্নের মুখ সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ়ভাবে বন্ধ হইয়া যায়, কিন্তু, পাকস্থলীর পরিপাক ক্রিয়া শেষ হইলেই, উহা খুলিতে আরম্ভ করে ও প্রথমে যাহা পরিপাক হইয়াছে, তাহাই প্রথমতঃ ক্রমে ক্রমে নিম্নে নামিতে থাকে। পরিশেষে যাহা পরিপাক হয় নাই, তাহাও নীচে নামিয়া যায়।

পাকস্থলীর ভিতরের প্রাচীর চুঁয়াইয়া যে বিভিন্ন জাতীয় রস পড়ে, ঐ পাচক রসসমূহ খাদ্যমণ্ডের সহিত মিশ্রিত হইয়া আমিষজাতীয় উপাদানকে জীর্ণ করিয়া থাকে অর্থাৎ রক্তস্রোতে মিশিয়া যাইবার উপযুক্ত করিয়া থাকে। অনেকে বলেন, পাকস্থলীমধ্যে স্নেহজাতীয় উপাদানের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না। কেহ কেহ এ মতের বিরোধী। যাহাই হউক, পাকস্থলীর পাচক রসসমূহ নির্গমের কোন ব্যতিক্রম ঘটিলে, অম্ল ও অজীর্ণ রোগ দেখা দেয়।

গ্রহণীর কার্য্য—পাকস্থলীর কার্য্যশেষে হইলে, উহার নীচের দিকের দরজাটী খুলিয়া যায় ও খাদ্যমণ্ড 'গ্রহণী' (Duodenum) নামক বাঁকা নলের মধ্যে নামিয়া আসে। খাদ্যমণ্ড গ্রহণীর মধ্যে আসিলে তথায় যকৃৎ হইতে পিত্ত নামক পাচকরস এবং অগ্ন্যাশয় (Pancreas) নামক যন্ত্র হইতে অন্য এক প্রকার রস

প্রাপ্ত হয়। ঐ রস সকল প্রধানতঃ শালি ও স্নেহ জাতীয় উপাদানের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া তাহাদিগকে পরিপাক করিয়া থাকে। (যকৃত বিকৃত বা ও পিত্ত নিঃসরণ বন্ধ হইলে, স্নেহজাতীয় খাদ্য, তৈল, চর্ব্বি, ঘৃত প্রভৃতি সহজে পরিপাক হয় না।) ইহা ভিন্ন আমিষজাতীয় ও অন্যান্য উপাদান পাকস্থলীর রসসমূহে যদি একেবারে জীর্ণ না হইয়া থাকে, তাহা গ্রহণীর রস সমূহের সংযোগে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া রক্তের সঙ্গে মিশিবার উপযোগী হয়।

ক্ষুদ্রান্ত্র। গ্রহণীর নীচে হইতে ক্ষুদ্রান্ত্র (small Intestines) আরম্ভ হইয়াছে। অতঃপর ক্ষুদ্রান্তের রসে ভুক্তদ্রব্যের সকলজাতীয় উপাদানই নিঃশেষে পরিপাক প্রাপ্ত হয়। এই স্থান হইতে প্রায় সকল খাদ্যের সারভাগ শরীরের রক্তের মধ্যে শোষিত হইতে থাকে। ক্ষুদ্রান্ত্রে ভুক্ত পদার্থ শোষিত হইবার দুইটী পথ আছে। (১) রক্তবহা নাড়ী (Blood vessels (২) রসবাহিনী নাড়ী (Lymphatic Vessels or Lacteals)। বেশীর ভাগ খাদ্যদ্রব্য, যথা মৎস্য, মাংস ও শ্বেতসার প্রভৃতি রক্তবহা নাড়ী কর্ত্তৃক শোষিত হয় তৈল, ঘৃত, চর্ব্বি প্রভৃতি স্নেহপদার্থ রসবাহিনী নাড়ী কর্ত্তৃক শোষিত হয়।

বৃহৎ অন্ত্র। ক্ষুদ্রান্ত পরিত্যাগ করিয়া পরিপক্ব খাদ্যের অবশিষ্ট অংশ তরল অবস্থায় বৃহদন্ত্রে গিয়া পড়ে। বৃহদন্ত্রের পেশীগুলির গতিতে উহা হইতে জলের ভাগ শোষিত হয় ও উহা শক্ত মলে পরিণত হয়। বৃহদন্ত্রে অবস্থিত জীবাণুর ক্রিয়াফলে এই মল দুর্গন্ধযুক্ত হয় এবং পরিশেষে মলাশয় পথে (Rectum) বাহিরে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে।

কতকগুলি সর্ব্বদা প্রচলিত খাদ্য আমাদের পাকস্থলীতে পরিপাক প্রাপ্ত হইতে, কত সময় লাগিয়া থাকে, তাহা আহারবিধি অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি।

পঞ্চদশ অধ্যায়

কতিপয় সাধারণ রোগে পথ্যবিধি

খাদ্যদ্রব্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি, এবং শরীরের পক্ষে কোন্ কোন্ খাদ্যের প্রয়োজন ও কোন্ জাতীয় খাদ্যের অভাব ঘটিলে শরীরমধ্যে কি কি রোগ প্রকাশ পায় প্রসঙ্গক্রমে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। অতঃপর, কতিপয় সাধারণ রোগে কিরূপ পথ্য গ্রহণ করা উচিত, তৎসম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিব। ঔষধ অপেক্ষা সুনিয়মিত পথ্যের দ্বারা যে, অনেকক্ষেত্রে রোগ আরোগ্য অথবা সহজসাধ্য করা যায়, সে কথা বর্ত্তমান যুগে বহুবার প্রমাণিত হইয়াছে।

অজীর্ণ

ব্যক্তি ভেদে অজীর্ণ রোগের নিদান, প্রকৃতি ও লক্ষণ বিভিন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং অজীর্ণ রোগে কোন সাধারণ পথ্য-বিধি নির্দ্দেশ করা যায় না। তরুণ ও পুরাতন, দুই প্রকার অজীর্ণ রোগ সচরাচর দেখা যায়। আহারের অনিয়ম, রাত্রিজাগরণ, গুরু ভোজন, ভেজাল দ্রব্য আহার প্রভৃতি কারণে তরুণ অজীর্ণ রোগ দেখা দেয়। এস্থলে, উপবাস ও লঙ্ঘন দেওয়া বিধি এবং সর্ব্বপ্রকারে বিশ্রাম গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। প্রয়োজন হইলে, চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত।

রোগ দীর্ঘস্থায়ী হইলে পুরাতন (chronic) এবং কঠিন আকার ধারণ করে। পুরাতন অজীর্ণ রোগীমাত্রেই, এই পুস্তকের একাদশ অধ্যায়ে লিখিত আহারবিধির উপদেশগুলি অবশ্য প্রতিপালন করিবেন। এতদ্ব্যতীত, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ, প্রত্যহ নিয়মিত সহজসাধ্য ব্যায়াম,

ভ্রমণ, অভ্যঙ্গ পূর্ব্বক প্রত্যহ স্নান এবং স্নানের পর শুষ্ক বস্ত্রখণ্ড দ্বারা গাত্র চর্ম্ম ঘর্ষণ, রাত্রে নিয়মিত সময়ে শয়ন এবং যাহাতে রাত্রে সুনিদ্রা হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবেন। শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা এ রোগে বিশেষ প্রয়োজন। কেবলমাত্র সংযম অভ্যাস করিয়া, অনেকে রোগমুক্ত হইয়াছেন।

সাধারণতঃ, বিদাহী অর্থাৎ ভাজা দ্রব্য এ রোগে সহ্য হয় না এবং ভাজা জিনিষ না খাওয়াই উচিত। ভাজা জিনিষের পরিবর্ত্তে সিদ্ধ বস্তু সেবনে উপকার হয় এবং সহজে পরিপাক হয়। চা, কফি, তামাক, সিদ্ধি, সুরা প্রভৃতি উত্তেজক বা মাদক দ্রব্য সেবন এবং অতিশয় উষ্ণ বা অতি শীতল দ্রব্য, অতিরিক্ত মসলা, ঘৃত বা তৈল সংযুক্ত খাদ্য পরিবর্জ্জনীয়।

নিম্নলিখিত খাদ্যগুলি সুপথ্য—

শাক-সব্জী।—কাঁচা পেঁপে, ডুমুর, পটোল, পলতা, কাঁচকলা।

ফল।—টাট্‌কা পাকা ফল অল্প পরিমাণে। কচি ডাবের জল ও নরম শাঁস, আনারস।

ডাল।—মুগ, মসুর, কলাইয়ের দাল।

মাছ-মাংস।—ক্ষুদ্র জাতীয় মৎস্য (সিদ্ধ করিয়া) ও কচি মাংস।

ডিম।—না খাওয়াই উচিত। অর্দ্ধসিদ্ধ বা কাঁচা অবস্থায় খাওয়া চলিতে পারে।

প্রধান খাদ্য।—পুরাতন চাউলের অন্ন অতি অল্প পরিমাণে।

জল খাবার।—বাসি পাঁউরুটি, মুড়ি, খই, চিঁড়া, (গরম জলে ভিজাইয়া, পরে ঘোলের সহিত)

অন্য দ্রব্য।—ঘোল সেবন সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়। সহ্য হইলে কিছুদিন দুধের উপর কেবলমাত্র নির্ভর করিয়া অনেকে উপকার পাইয়াছেন। কাহারো কাহারো দুধ আদৌ সহ্য হয় না, সেক্ষেত্রে অবশ্য দুধ পরিবর্জ্জনীয়। চিনির পরিবর্ত্তে মিছরি ব্যবহার্য্য।

নিম্নলিখিত খাদ্যগুলি কুপথ্য—

নূতন চাউলের অন্ন, টাটকা পাউরুটি, সর্ব্বপ্রকার সংরক্ষিত খাদ্য, পাকা মাছ, পার্শে, ভেট্‌কি, ইলিশ, ও পুঁটি মাছ, চর্ব্বিযুক্ত মাংস, চিংড়ী কাঁকড়া, মাছের ডিম, চিনি, বাজারের খাবার, আপেল, আমড়া, পিয়ারা, কদলী, ন্যাসপাতী প্রভৃতি গুরুপাক ফল, পিষ্টক পায়স প্রভৃতি, বিলাতী কুমড়া, আলু, সোডার জল, বরফ, কুলপী বরফ বা আইস্‌ ক্রীম প্রভৃতি।

অজীর্ণ রোগে রন্ধন প্রণালী—

আমাদের দেশে 'পোরের ভাত" প্রস্তুত করিতে যেরূপ মৃদুজ্বাল ব্যবহার করা হয়, সেইরূপ মৃদু জ্বালে প্রস্তুত অন্নাদি অজীর্ণ রোগীর পক্ষে হিতকর। আজ কাল Icmic Cooker বা অনুরূপ যে সমস্ত কুকার প্রস্তুত হইয়াছে, তদ্দ্বারা এ কার্য্য সিদ্ধ হয়।

আহার সম্বন্ধে খুব অতিরিক্ত খুঁৎ খুঁৎ করিলে, ভুক্ত বস্তু সহজে পরিপাক হয় না। তাই একটা কথা প্রচলিত আছে যে, যে ব্যক্তি সকালে কি আহার করিয়াছে বৈকালে তাহা স্মরণ করিতে পারে না, সাধারণতঃ তাহার পরিপাক-শক্তি উত্তম। ফলতঃ, আহার সম্বন্ধে অমনোযোগ যেমন দোষাবহ, আহারের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে অহরহঃ চিন্তাও সেইরূপ দোষকর।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, অজীর্ণ রোগের নিদান, প্রকৃতি ও লক্ষণ দেখিয়া, এবং, ব্যক্তিগত রুচি ও রোগীর প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া সুপথ্য নির্দ্দেশ করিলে, পুরাতন অজীর্ণ রোগে কোন ঔষধ সেবন করা প্রয়োজন হয় না। বস্তুতঃ, এ রোগে দীর্ঘকাল কোন ঔষধ সেবন না করাই মঙ্গল। সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে, অজীর্ণ রোগকে তিনটী শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—(১) পাকস্থলী হইতে অল্প পরিমাণে পাচক রসের ক্ষরণ হেতু, (২) পাচক রসের আধিক্য হেতু, (৩) পাকস্থলীর মাংস পেশী সমূহের দুর্ব্বলতা জনিত।

পাচক রসের অল্পতায়—

নরম খাদ্য অপেক্ষা শক্ত খাদ্য এ ক্ষেত্রে হিতকারী, কারণ, শক্ত দ্রব্য উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া খাইতে হইলে, স্বভাবতঃ অধিক পরিমাণে লালারসের ক্ষরণ হয় এবং তদ্দ্বারা পরিপাককার্য্যের সহায়তা হয়। শালি-জাতীয় (শ্বেতসার) খাদ্য এ ক্ষেত্রে হিতকর—কাজেই, মুড়ি, খই, চিঁড়া, বাসি পাঁউরুটি প্রভৃতি শ্বেতসারপ্রধান শক্ত খাদ্য খাওয়া প্রয়োজন। স্নেহ জাতীয় খাদ্যের মধ্যে ঘৃত ও তৈল সহ্য না হইলেও, অল্প মাত্রায় মাখন সহ্য হয়। মাংস, দাল, মৎস্য প্রভৃতির প্রোটীন, পাচক রসের অল্পতা হেতু পরিপাক হয় না।

পাচক রসের আধিক্য জনিত—

এ অবস্থায় শ্বেতসারপ্রধান খাদ্যের পরিমাণ কমাইয়া দিয়া প্রোটীনের মাত্রা বাড়াইয়া দেওয়া উচিত। রুটি, ভাত, আলু, চিনি ইত্যাদির পরিবর্ত্তে দুধ, ছোট মাছ, কচি মাংস, অর্দ্ধ সিদ্ধ ডিম, মাখন, প্রভৃতি হিতকারী। চিনি, মিষ্টান্ন, অম্লদ্রব্য, লবণাক্ত পদার্থ ও অতিরিক্ত মসলা সংযুক্ত খাদ্য এবং মাংসের সুরুয়া ও নির্য্যাস পরিবর্জ্জনীয়।

পাকাশয়ের মাংস পেশীর দুর্ব্বলতায়—

কাঁচা শাক সব্জি ভক্ষণ নিষিদ্ধ। ফল ভাপ্‌রায় সিদ্ধ করিয়া অথবা ফলের রস যথেষ্ট পরিমাণে পান করা কর্ত্তব্য। কোনও সময়েই এককালীন আহার বেশী পরিমাণে করা উচিত নয়, অর্থাৎ আহার বারে বাড়াইয়া দিয়া পরিমাণে অল্প করিয়া দেওয়া উচিত; কিন্তু, কদাচ সারা দিন রাত্রে চারিবারের অধিক আহার করা আযৌক্তিক। পুরাতন চাউলের অন্ন, এবং মাখন এরূপ রোগীর উপযোগী। কোনরূপ গুরুপাক দ্রব্য এবং রুটি এরূপ রোগীর বর্জ্জন করা উচিত।

বুদ্ধিমান রোগীমাত্রেই দুই চারিদিন বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিলে, নিজের রোগের প্রকৃতি নির্ণয় করিতে পারিবেন। অতঃপর উপরি উক্ত পথ্যবিধি সমূহ হইতে নিজের রুচি অনুযায়ী খাদ্য নির্ব্বাচন করিয়া লইলে, এবং সদভ্যাস ও আহারবিধি যথারীতি পালন করিলে, নিশ্চয়ই সুফল লাভ করিবেন।

অর্শ

যে সকল খাদ্যের দ্বারা বায়ুর অনুলোম হয় এবং অগ্নি ও বলের বৃদ্ধি হয়, সেই সকল খাদ্যই অর্শ রোগে সুপথ্য। যাহাতে প্রত্যহ কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, অর্শ রোগী সেদিকে লক্ষ্য রাখিবেন। (কোষ্ঠবদ্ধতা পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

সুপথ্য—

পুরাতন চাউলের কোমল অন্ন ; ওল, কাঁচা পেঁপে, পটল, ঢ্যাঁড়শ, পুঁইশাক, বেগুণ, বিলাতী কুমড়ার তরকারি ; মুগ বা কলাইয়ের দাল ; দুগ্ধ, মাখন, ঘোল, ঘৃত প্রভৃতি স্নেহজাতীয় পদার্থ ; অন্ততঃ কিছু মিছরী ও মাখন, কিম্বা মাখন ও ঘোল প্রত্যহ সেব্য। পাকা পেঁপে, পাকা বেল, কিসমিস, মনাক্কা, খেজুর, আঙ্গুর প্রভৃতি সুরসাল ফল ; ক্ষুদ্রজাতীয় মৎস্য মধু, গুড়।

কুপথ্য—

গুরুপাক দ্রব্য, ভাজা ও পোড়া জিনিষ, পাঁউরুটি টোষ্ট, দধি, পিষ্টক, লাউ, সিম, মোচা, কাঁচকলা, এঁচোড়, নূতন আলু, মাষকলাই, লঙ্কার ঝাল ও অতিরিক্ত মসলা, মাংস, বৃহৎ জাতীয় মৎস্য, চিংড়ী, কাঁকড়া, ডিম, চা, কফি, কোকো প্রভৃতি পানীয়।

প্রত্যহ স্রোতস্বতী নদীর জলে অবগাহন স্নান, এই রোগে হিতজনক। কঠিন আসনে উপবেশন, অগ্নির উত্তাপ ও রৌদ্র সেবন নিষিদ্ধ। খোসা

ছাড়ানো কৃষ্ণ তিল, আমলকী ও যষ্টি মধু এই রোগে হিতকর। পূর্ব্ব রাত্র হইতে ভিজানো কৃষ্ণ তিলের খোসা ছাড়াইয়া, কিয়ৎপরিমাণে আমলকী চূর্ণ অথবা যষ্ঠি মধু চূর্ণের সহিত মিশাইয়া, মধু, মিছরী অথবা মাখন সহ প্রত্যহ সেব্য। রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে, দুধের সহিত কিসমিস বা মনাক্কা জ্বাল দিয়া পান করিলে, প্রভাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় এবং দাস্ত কোমল হয়।

কোষ্ঠবদ্ধতা

এ রোগে আজকাল অনেকেই ভুগিয়া থাকেন। যথেষ্ট পরিমাণে জল না খাওয়া এ রোগের অন্যতম কারণ। যে কোন রূপেই হউক প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তির দিনে অন্ততঃ দেড় সের জল পান করা কর্ত্তব্য। আমাদের দেশে পূর্ব্বে উষাপান প্রচলিত ছিল। সূর্যা উঠিবার পূর্ব্বে অর্দ্ধ সের শীতল জল পান করাকে উষাপান করা বলে। উষাপানে কাহারো কাহারো প্রথম প্রথম সর্দ্দি হয়, কিন্তু দুই তিন দিন অভ্যাস হইয়া গেলে আর সর্দ্দির ভয় নাই। কোষ্ঠবদ্ধ রোগীর নিত্য উষাপান করা কর্ত্তব্য এবং রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে একগ্ল্যাস জল পান করা দরকার। চা পান না করাই ভাল।

কোষ্ঠবদ্ধ রোগীর যথেষ্ট শাক-সব্জি ভক্ষণ করা বিধেয়। উহাদের দুষ্পাচ্য অংশগুলি মলত্যাগ বিষয়ে সাহায্য করে। কাঁচা পেঁপের তরকারি, বিলাতী কুমড়া, ডুমুর ও বেগুন (পোড়া) কোষ্ঠ পরিষ্কার করে। কাঁচকলা কোষ্ঠ বদ্ধ করে, অতএব পরিত্যাগ করা উচিত। আলু, মানকচু প্রভৃতি মূলজ খাদ্য স্বল্প পরিমাণে গ্রাহ্য। খোসা শুদ্ধ তরকারী এ রোগে হিতকর। আম, আমড়া, আতা, আপেল, আঙ্গুর, কমলালেবু, কিসমিস, পাকাকলা, খেজুর, মনাক্কা, পাকা পেঁপে, পাকা বেল প্রভৃতি ফল রেচক গুণ বিশিষ্ট। চীনা বাদাম, আখরোট, বাদাম, পেস্তা, কাঁচা বেল প্রভৃতি

পরিবর্জ্জনীয়। ডিম ও মাংস পরিত্যাজ্য। দুগ্ধ, ঘৃত, মাখন, গুড় ও মধু উপযুক্ত পরিমাণে ব্যবহার করিতে পারা যায়।

কোষ্ঠবদ্ধ রোগী প্রতিদিন যাঁতায় ভাঙ্গা লাল আটা ব্যবহার করিবেন।

উপযুক্ত মাত্রায় ব্যায়াম, অঙ্গচালনা, উন্মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ এবং প্রতিদিন প্রাতে শয্যাত্যাগ করিয়াই (মলত্যাগ হউক বা নাই হউক) মলত্যাগ করিতে বসার অভ্যাস করা উচিত।

শৈশবে, যৌবনে এবং প্রৌঢ়াবস্থায় প্রতিদিন কোষ্ঠ পরিষ্কার হওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন, কিন্তু, বার্দ্ধক্যে, এমন কি, পঞ্চাশ উত্তীর্ণ হইলে, প্রতিদিন কোষ্ঠ পরিষ্কার হওয়া ততটা প্রয়োজন নহে। প্রতিদিন নিয়মিত কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না বলিয়া আমরা অনেক বৃদ্ধ ব্যক্তিকে অভিযোগ করিতে শুনিয়াছি। তাঁহাদের জানিয়া রাখা উচিত যে, বার্দ্ধক্যে কোষ্ঠবদ্ধতা ততটা অনিষ্টকর নহে, বরং, যাঁহাদের কোষ্ঠবদ্ধতা আছে (constipated constitution) সেরূপ বৃদ্ধ সচরাচর একটু দীর্ঘজীবি হন।

কোষ্ঠবদ্ধতার জন্য অনেকে নিয়মিতরূপে জোলাপ লইয়া থাকেন। বেশীদিন জোলাপ লওয়ার কুফল অবশ্যম্ভাবী। অতএব, পথ্য-নির্ব্বাচনের দ্বারা, কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেরই উচিত। যদি একান্তই ঔষধির আশ্রয় লইতে হয়, তবে আধতোলা হরিতকী চূর্ণ, আধতোলা চিনি ও এক ছটাক গরম জল সহ প্রত্যহ রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে সেব্য। অথবা জাঙ্গী হরিতকী কাঠ খোলায় ভাজিয়া, উহার চূর্ণ চারি আনা এবং চারি আনা চিনি একত্রে মিশাইয়া, এক ছটাক গরম জল সহ রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে সেবনীয়। কিন্তু, স্মরণ রাখিবেন, যাঁহাদের শরীর পিত্তপ্রধান অথবা বায়ুপিত্তপ্রধান কিম্বা কফপিত্তপ্রধান, হরিতকী তাঁহাদের পক্ষে বিষম অপকারী। এতদ্ব্যতীত, পথশ্রান্ত, দুর্ব্বল, উপবাসী, ব্যক্তি এবং গর্ভবতী নারীগণের হরিতকী ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

কৃশতা

কৃশতা স্বাস্থ্যের লক্ষণ নহে। বয়স ও দৈর্ঘ্যের অনুপাতে দৈহিক ওজনের সামঞ্জস্য থাকা বিধেয়। বাঙ্গালী ছাত্রসমাজে এই ওজনের সামঞ্জস্যের অভাব অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়। underweight ছাত্রের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হইয়া পড়িয়াছে। ইহার কয়েকটি কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে :—

১। উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব। খাদ্যে—ছানা (প্রোটীন্) মাখন (ফ্যাট্) ও শর্করা (কার্ব্বোহাইড্রেট) জাতীয় উপাদান এবং খাদ্য প্রাণ (ভাইটামিন্) যথেষ্ট পরিমাণে না থাকা, ইহার মূল কারণ।

২। অজীর্ণ, দন্তের পীড়া, কৃমি-রোগ, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, টন্‌সিল্ জনিত রোগ, যক্ষ্মা প্রভৃতি ব্যাধি,—অথবা কোনরূপ কৌলিক ব্যাধির বিদ্যমানতা। বলা বাহুল্য, এ সকল ক্ষেত্রে চিকিৎসকের দ্বারা মূল ব্যাধির প্রতিকার সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক।

৩। ব্যায়াম, বিশুদ্ধ বায়ুসেবন ও চিত্তের প্রফুল্লতার অভাব। অতিকৃশ ব্যক্তির পক্ষে অতিরিক্ত ব্যায়াম নিষিদ্ধ, পদব্রজে উন্মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। চিত্তের প্রফুল্লতার অভাব হইলে, একমাত্র খাদ্য বা ঔষধের উপর নির্ভর করিয়া পূর্ণ শারীরিক স্বাস্থ্যের আশা করা যায় না।

৪। কদভ্যাস। কোনোরূপ কদভ্যাস থাকিলে, তাহা সর্ব্বাগ্রে বর্জ্জন করিতে হইবে।

পথ্য :—সহজপাচ্য পুষ্টিকর মিশ্রখাদ্য অর্থাৎ যে খাদ্যে দেহের প্রয়োজনীয় (আমিষ, স্নেহজাতীয়, লবণজাতীয়, শালিজাতীয়—এবং বিভিন্ন ভাইটামিন্) উপাদান থাকিবে, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। আমরা সচরাচর যে সকল খাদ্য খাইয়া থাকি, তাহার সহিত যথেষ্ট পরিমাণে ফল, মাখন ও দুধ সংযোগ করিলে বাঞ্ছনীয় ফল পাওয়া যাইবে।

দুধ কৃশতা নিবারক। অতএব, যথেষ্ট পরিমাণে দুধের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। বলা বাহুল্য, পরিপাক শক্তির উপর নির্ভর করিয়া ধীরে ধীরে পথ্যের মাত্রা বাড়াইতে হইবে, নচেৎ কুফল ফলিবে। অধিকন্তু, অকস্মাৎ দেহের ওজন বাড়িয়া যাওয়া ভাল লক্ষণ নহে, দেহের ওজন ক্রমশঃ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হওয়াই দরকার। কেহ কেহ কাঁচা বা অর্দ্ধ সিদ্ধ ডিম এবং ছাগের যকৃৎ বা মেটে পথ্যের সহিত ব্যবস্থা করিয়া উত্তম ফল পাইয়াছেন।

বাত

স্বাস্থ্যের সাধারণ নিয়ম এবং পথ্যের নিয়ম কানুন যথাযথ মানিয়া চলিলে, বাত রোগী বিশেষ উপকার পাইয়া থাকেন।

সাধারণ নিয়ম—

১। নিয়মিত ব্যায়াম। ব্যায়াম করিতে অপারগ হইলে, প্রত্যহ প্রাতে বা সন্ধ্যায় দুই এক মাইল ভ্রমণ। ক্লান্তি বোধ করিলেই, কিন্তু, পরিশ্রম ত্যাগ করিতে হইবে। মোটের উপর, প্রত্যহ কিছু ঘর্ম্ম-নিঃসরণ হওয়া দরকার। পক্ষান্তে একবার Steam bath লওয়া কর্ত্তব্য। বড় ফোকর বেতের একটি চেয়ারের নিম্নে উত্তপ্ত বা বাষ্পশীল বেড়েলামিশ্রিত জল পূর্ণ হাঁড়ি রাখিয়া,—চেয়ারের উপরে নগ্নদেহে উপবেশন পূর্ব্বক, মোটা কম্বলের দ্বারা নিজের গল দেশ হইতে চেয়ারের পায়াগুলি পর্য্যন্ত চতুর্দ্দিকে উত্তমরূপে আচ্ছাদিত করিতে হইবে। এরূপ অবস্থায় ১০।১৫ মিনিট বসিয়া থাকিতে হয়, তাহাতে অভ্যন্তরস্থ উত্তপ্ত বাষ্পের সংস্পর্শে দেহ হইতে দূষিত ঘর্ম্ম নিঃসারিত হইয়া যায়। এই বাষ্পস্নানের সময়, মস্তক একটি আর্দ্র গামছা দ্বারা শীতল রাখিবেন এবং মধ্যে মধ্যে একটু একটু জল পান করিবেন। নিতান্ত দুর্ব্বল ব্যক্তির বাষ্পস্নান অনুচিত।

২। প্রত্যহ অভ্যঙ্গ পূর্ব্বক স্নান। অপর কাহারো দ্বারা রীতিমত তৈল মর্দ্দন করাইতে পারিলে ভাল। স্নানের অন্তে শুষ্ক তোয়ালে (Bath

Towel অথবা Flesh Brush) সাহায্যে গাত্রচর্ম্ম ঘর্ষণ দ্বারা—চর্ম্মের Reaction বা প্রতিক্রিয়া বর্দ্ধন করা উচিত।

৩। অধিক মাত্রায় জল পান করা বিধেয়। যাহাতে মূত্র যথোচিত পরিমাণে নিঃসারিত হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

৪। কোষ্ঠ-বদ্ধতা যাহাতে না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

৫। রাত্রিজাগরণ বা অধিক রাত্রে শয়ন নিষিদ্ধ। অতিনিদ্রা বর্জ্জনীয় এবং দিবানিদ্রা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

৬। গুরুপাক দ্রব্য, অতিরিক্ত মসলা ও ঘৃত সংযুক্ত খাদ্য, অধিক মিষ্টান্ন, মাদকদ্রব্য ও চা পান বর্জ্জনীয়।

৭। মধ্যে মধ্যে উপবাস করা ও লঙ্ঘন দেওয়া বিধেয়।

পথ্যবিধি—

আমরা যে সকল খাদ্য খাইয়া থাকি, তাহার কতকগুলির প্রতিক্রিয়া অম্লত্বজনক (acid), কতকগুলির প্রতিক্রিয়া ক্ষারত্বজনক (alkaline) এবং কতকগুলির প্রতিক্রিয়া সমভাবাপন্ন (neutral)। বাত রোগীর পক্ষে অম্লত্বজনক প্রতিক্রিয়াবিশিষ্ট খাদ্য পরিবর্জ্জনীয়। রক্তের ক্ষারধর্ম্ম বজায় রাখিবার জন্য বাত রোগীর ক্ষারবর্দ্ধক খাদ্য গ্রহণ করা উচিত।—

ক্ষারত্ববর্দ্ধক খাদ্য।—দুধ, কমলালেবু, পাকা আম, নারিকেল, খেজুর, আপেল, লেবু, কচি বেল, তরমুজ, আঙ্গুর কিশমিস্ প্রভৃতি—ফল, কুমড়া, চিচিঙ্গা, বেগুন, শিম, বাঁধাকপি, ফুলকপি, গাজর, শালগম, লেটুশ ইত্যাদি সবজি।

মাখন, দুধের সর ও চিনি—সমভাবাপন্ন (neutral) খাদ্য। সুতরাং বাত রোগী খাইতে পারেন, তবে বাত রোগীর পক্ষে, এ সকল বস্তু স্বল্প পরিমাণেই ব্যবহার করা উচিত।

মৎস্য, মাংস ও ডিম—অম্লত্বজনক খাদ্য—সুতরাং এগুলি বর্জ্জন করিতে হইবে। অন্ততঃ রোগের তরুণ অবস্থায় এবং যাঁহারা শ্রম

বিমুখ তাঁহাদের পক্ষে নিরামিষ আহারই প্রশস্ত। আয়ুর্ব্বেদে বাতরোগে মৎস্য ভক্ষণের বিধান আছে, কিন্তু, দ্রব্যগুণের আলোচনা করিলে দেখা যায়, যে,—ক্ষুদ্র রোহিত, কই, মাগুর, মৌরলা ও শিঙ্গী মাছ বাত-রোগে ব্যবহার করা চলিতে পারে। মাছের ডিম খাওয়া উচিত নয়।

এতদ্ব্যতীত, আমাদের খাদ্যদ্রব্যে Purin Bodies নামক এক প্রকার দূষিত পদার্থ আছে, এই purin bodies সকল শরীর-অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া Uric Acid এ পরিণত হয় এবং পরিণামে বাত উৎপাদন করে। কোন্ কোন্ পদার্থে purin bodies আছে :—

(১) মাংস, মেটে এবং কোন কোন মৎস্যে অধিক পরিমাণে থাকে।

(২) আলু, পিঁয়াজ, দাল, মূলা, শাক, মাষকলায়ের দাল, এঁচোড়, কাঁচা আম, ঝিঙ্গা, করলা, ঢেঁড়শ, পানিফল এবং কোন কোন মৎস্যে সামান্য পরিমাণে।

ডিমে purin bodies মোটেই নাই। কিন্তু, ডিমের মধ্যে protin বা ছানাজাতীয় উপাদান অধিক থাকাতে, ডিম বাতরোগীর উপযোগী নহে। বস্তুতঃ বাত রোগে প্রোটীন্ অর্থাৎ ছানা বা আমিষ জাতীয় খাদ্য অতিশয় অহিতকর।

সংক্ষেপে, প্রচলিত খাদ্যের মধ্যে বাত রোগীর পক্ষে কোন্ কোন্ খাদ্য হিতকর এবং কোন্‌গুলি অনিষ্টকর তাহা আমরা নিম্নে একত্রে সন্নিবেশিত করিলাম।

শাক। আয়ুর্ব্বেদের মতে শাঞ্চে শাক এবং চুকা পালং বাতঘ্ন। অন্যান্য শাক বর্জ্জনীয়।

তরকারি। পটল, বেগুন, কুমড়া, চিচিঙ্গা, সিম, বাঁধাকপি, ফুল-কপি, গাজর, শালগম, লেটুশ, লাউ, ধুঁদুল, শজিনার ডাঁটা ও ফুল, মোচা থোড়, কাঁচা পেঁপে, ডুমুর এবং পুরাতন তেঁতুল বাতে উপকারী। এঁচোড়,

পিঁয়াজ, মুলা, উচ্ছে—করোলো ও ঝিঙ্গা—বাতে অপকারী। আলুতে (যদিও আলু ক্ষারত্ব বর্দ্ধক তথাপি) অল্প পরিমাণে (purin bodies) পিউরিণ বিষ—আছে, সুতরাং আলু বর্জ্জন করিতে না পারিলে, খুব অল্প পরিমাণে খাওয়া উচিত।

দাল। দালে ছানাজাতীয় protin প্রোটীন উপাদান যথেষ্ট আছে অধিকন্তু, ইহাতে সামান্য পরিমাণে (purin bodies) পিউরিণ বিষও আছে, তবে অন্যান্য দাল অপেক্ষা মসুরদালে পিউরিণের মাত্রা কম। তরণ বাত রোগীর পক্ষে সর্ব্বপ্রকার দাল, কড়াই শুঁটি, বরবটী, বিশেষ করিয়া মটর দাল, ছোলার দাল ও অড়হর দাল খাওয়া উচিত নয়। পুরাতন বাতরোগী অল্প পরিমাণে মুগের ও মসুরের দাল ব্যবহার করিতে পারেন।

মৎস্য। তরুণ বাতরোগীর পক্ষে এবং যাঁহারা শ্রমবিমুখ সেই সকল বাতরোগীর পক্ষে নিরামিষ আহার প্রশস্ত। পুরাতন বাতরোগী ছোট রুই, কই, মাগুর, শিঙ্গী, মৌরলা মাছ খাইতে পারেন। কাঁকড়া, চিংড়ী পাকা মাছ, মাছের ডিম, বোয়াল, ভেটকী প্রভৃতি তৈলাক্ত মাছ বাতরোগীর বিষবৎ পরিত্যাজ্য।

পক্ষীডিম্ব। পরিত্যাজ্য।

মাংস। তরুণ রোগীর সকল প্রকার মাংসই অসেব্য। পুরাতন রোগী কখনও কখনও অল্পমাত্রায় কচি মাংস (ছোট জন্তুর অথবা কুক্কুটের) অল্প মশলা সংযোগে খাইতে পারেন। তবে শ্রমবিমুখ ব্যক্তির মাংস না খাওয়াই ভাল। হংস প্রভৃতি পক্ষীর মাংস পরিত্যাজ্য। মাংসের কাথ অভক্ষ্য।

দুগ্ধজাত দ্রব্য। দুধ, দুধের সর, মাখন, পণির, ঘৃত, ঘোল সম-ভাবাপন্ন (neutral) খাদ্য এবং ইহাদের মধ্যে (purin bodies)

পিউরিণ বিষ নাই, সুতরাং বাতরোগী—উপযুক্ত পরিমাণে ব্যবহার করিতে পারেন। ঘৃত, ছানা এবং পনির খুব সংযত পরিমাণে ব্যবহার করিবেন।

মিষ্ট দ্রব্য। চিনি (neutral) সমভাবাপন্ন খাদ্য, কিন্তু. বাতরোগীর পক্ষে অধিক মিষ্ট দ্রব্য খাওয়া উচিত নয়। পায়সান্ন, পিষ্টক, কেক, পুডিং, মোরব্বা, জ্যাম, জেলি, অতিমাত্রায় সন্দেশাদি অহিতকর।

চা, কফি, কোকো। এ সকল দ্রব্যে অতিমাত্রায় (purin bodies) পিউরিন্ বিষ আছে, সুতরাং পরিত্যাজ্য। অক্ষমপক্ষে অল্প মাত্রায় পাতলা চা পান বিধেয়।

লবণ। অল্প পরিমাণে ব্যবহার্য্য।

ফল। পাকা আম, আপেল, আঙ্গুর, কমলালেবু, খেজুর, লেবু, কচি-বেল, তরমুজ, খরমুজ—কচি শশা, কিসমিস্, আনারস, মাঝারি ইক্ষু, তালশাঁস প্রভৃতি বাতরোগে উপকারী। কাঁচা আম, কাঁঠাল, জাম, কয়েদবেল, ফুটি, পাকা তাল, কাঁচা করমচা ও পানিফল বাতরোগে অপকারী।

আটা ও চাল।—গোধূম বাতনাশক। (যব বাতজনক)। যাঁতায় ভাঙ্গা লাল আটা হিতকর। লুচির অপেক্ষা হাতে গড়া রুটি প্রশস্ত। পাঁউরুটী বর্জ্জন করাই ভাল। তবে আজকাল যে, লাল আটার পাঁউরুটি পাওয়া যায়, তাহা আগুনে সেঁকিয়া মধ্যে মধ্যে অল্প পরিমাণে ব্যবহার করা চলিতে পারে। রুটী ও পাঁউরুটীর প্রতিক্রিয়া (reaction) অম্লত্বজনক (acid) সুতরাং পরিমাণ সম্বন্ধে অবহিত হইতে হইবে। পুরাতন আতপ চাউলের অন্ন প্রশস্ত। ভাতের প্রতিক্রিয়া (reaction) অম্লত্বজনক (acid) সুতরাং ভাত অল্প পরিমাণে খাওয়া উচিত। বালাম চাল বর্জ্জন করাই ভাল।

বহুমূত্র

পথ্য নিয়ন্ত্রণের দ্বারা অনেক বহুমূত্র রোগী এই দুরন্ত রোগকে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন, এমন কি, কেহ কেহ পথ্য নিয়ন্ত্রণের দ্বারা এই ব্যাধি

হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন। সুযোগ্য চিকিৎসকের সহিত পরামর্শ করিয়া রোগী নিজের পথ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইবেন। আমরা এখানে সংক্ষেপে কতকগুলি সাধারণ বিধি এবং পথ্যের কথা উল্লেখ করিলাম।

সাধারণ বিধি—

১। স্থূলকায় প্রৌঢ় ব্যক্তিমাত্রেই পরিমিত আহার ও ব্যায়ামের দ্বারা শারীরিক ওজন হ্রাস করিবেন। শরীর যাহাতে মেদস্বী না হয়, সেদিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। প্রত্যহ ভ্রমণ, মুক্ত বায়ু সেবন, এবং কিছু কিছু ঘর্ম্ম নিঃসারিত করা আবশ্যক। কোন ঋতুতেই ঘর সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ করিয়া শয়ন করা উচিত নয়। ব্যায়াম করা সম্ভব না হইলে, গাত্রমর্দ্দন (massage) করাইলে উপকার হয়।

২। যাঁহাদের বংশে বহুমূত্র রোগ আছে, তাঁহারা যৌবন হইতেই, এবং স্থূলকায় প্রৌঢ় ব্যক্তিমাত্রেই শর্করাপ্রধান খাদ্য কমাইয়া দিবেন।

৩। ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা দেহের ওজঃ পদার্থ সংরক্ষণ করা একান্ত আবশ্যক। সচরাচর শরীরস্থ ওজোধাতুর ক্ষয়ে এই রোগের সূত্রপাত হয়।

৪। রোগের সূত্রপাতে মানসিক পরিশ্রম এবং সর্ব্বপ্রকার উত্তেজনা বর্জ্জনীয়।

৫। রোগ প্রকাশ পাইলে, চর্ম্ম সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিবেন। কোনরূপ ক্ষত বা স্ফোটক যেন জন্মিতে না পায়। আঁট জুতা পরিবেন না এবং সাবধানে নখ কাটিবেন, যেন নখের ধার কাটিয়া না যায়।

গ্রহণীয় খাদ্য—

রুটি।—যাঁতায় ভাঙ্গা চোকলা সমেত আটার রুটি, অথবা ভুসির রুটি।

দাল।—অল্প পরিমাণে।

শাকশব্‌জি :—পটল, পল্‌তা, বেগুন, ছাঁচি কুমড়া, লাউ, ঝিঙ্গা, ধুঁদুল, চিচিঙ্গে, সজিনার ডাঁটা ও ফুল, কাঁক্‌রোল, কাঁকুড়, মোচা, থোড়, উচ্ছে, করোলা, বিলাতী বেগুন, পিঁয়াজ, ফুলকপি, ওলকপি, বাঁধাকপি।

ফল।—যে সকল ফলে চিনির ভাগ কম, অম্লের ভাগ বেশী সেই সকল ফল।—কালোজাম, কুল, আনারস (অম্লরসাক্ত), অম্লরসাক্ত কমলা লেবু, বাতাবী লেবু, ডালিম। পেস্তা, বাদাম, আখরোট, চীনা বাদাম প্রভৃতিতে শর্করার ভাগ অল্প, সুতরাং ব্যবহার চলিতে পারে।

দুগ্ধ ও দুগ্ধ জাত দ্রব্য।—দধি, দুধ, (অল্প পরিমাণে), ঘোল, ছানা, ঘৃত ও মাখন।

আমিষ খাদ্য।—অল্প পরিমাণে সকল প্রকার তৈলাক্ত মাছ, এবং বসাযুক্ত মাংস, চিংড়ী, কাঁকড়া, ডিম।

মিষ্ট দ্রব্য।—সরবৎ প্রভৃতিতে স্যাকারিণ ব্যবহার চলিতে পারে।

বর্জ্জনীয় খাদ্য—

সকল প্রকার শ্বেতসারপ্রধান খাদ্য যথা—কলের ময়দা, চাউল, এরোরুট, সাগু, বালি, আলু, মানকচু, ওল, কাঁচা কলা, বীটপালং, রাঙ্গা আলু, আম, কাঁঠাল, কলা, বেল, আতা, পেঁপে, পেয়ারা, ইক্ষু, প্যানফল, কেশুর, আঙ্গুর, কিশ্‌মিশ, মনাক্কা, আপেল, খেজুর, সুমিষ্ট কুল, তাল, তালশাঁস, শশা।

মেদবৃদ্ধি

অতিস্থূলতা একটি রোগবিশেষ। অন্ততঃ অতিস্থূলতা হইতে বাত, বহুমূত্র, হৃদ্‌যন্ত্রের বিকলতা প্রভৃতি নানারূপ উপসর্গ দেখা দেয়। কোন কোন বংশে এই ব্যাধি কৌলিক রূপে দেখা যায়, আবার শ্রমবিমুখতা এবং অতি ভোজন প্রভৃতি দোষ জন্য অনেকেই যৌবনের শেষে অথবা মধ্য জীবনে মেদবৃদ্ধি রোগের দ্বারা আক্রান্ত হন। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন শরীরের

কতকগুলি গ্রন্থির (ductless glands, thyroid and pitutary) ক্রিয়াবৈষম্যে শরীর অতিশয় স্থূল হইয়া পড়ে। এমন কি, আহার্য্যের পরিমাণ যথাসাধ্য কমাইলেও, এ রোগের সহজে প্রতিকার করা যায় না।

সাধারণ বিধি।—মধ্যে মধ্যে উপবাস, প্রত্যহ নিয়মিত ব্যায়াম, নিদ্রার পরিমাণ কমাইয়া (৫।৬ ঘণ্টার অধিক নহে) দেওয়া এবং দিবা নিদ্রা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ। প্রত্যহ যাহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখা এবং জল ও তরল খাদ্যের পরিমাণ যথাসাধ্য কমাইয়া দেওয়া।

পথ্যবিধি।—starchy অর্থাৎ শ্বেতসার খাদ্য, যথা, ভাত, আলু, সাগু, বার্লি—প্রভৃতি খাদ্যের পরিমাণ কমাইতে হইবে। প্রয়োজন হইলে ভাত কিছুদিন বন্ধ দিয়া চিঁড়া, খই ও ঘৃত বর্জ্জিত ময়দা বা আটার রুটি খাওয়া উচিত। দুধ, ঘি, মাখন, তৈল ও চর্ব্বি ঘটিত খাদ্য এবং মিষ্টান্ন বর্জ্জন করিতে হইবে। ছানা, মাখন ও শর্করাজাতীয় খাদ্য বর্জ্জন পূর্ব্বক টাট্‌কা তরিতরকারী, ফলমূল, ক্ষুদ্রজাতীয় চর্ব্বি বা তেলশূন্য মৎস্য, যথা, রুই, মাগুর, শিঙ্গী প্রভৃতি, ডিমের শ্বেতাংশ এবং চর্ব্বিবিহীন ক্ষুদ্র ছাগের মাংস খাওয়া চলিতে পারে। দুধ ও চিনি এবং দুধ ও চিনি ঘটিত যাবতীয় খাদ্য সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। শিশু এবং বালকদিগের মধ্যে অনেকেই অনাবশ্যক পরিমাণে আলু খাইয়া অপ্রয়োজনীয় মেদ সঞ্চয় করে। সে ক্ষেত্রে, আলুর পরিমাণ কমাইয়া অন্যান্য তরকারি খাওয়ানো কর্ত্তব্য।

চিকিৎসকের পরমর্শ ব্যতীত অতিরিক্ত উপবাস দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। সাধারণতঃ, পক্ষান্তে একদিন নির্জ্জলা উপবাস দেওয়া বয়স্ক ব্যক্তিমাত্রেরই বিধেয়।

রক্তহীনতা

নানাবিধ রোগের পরিণামে রক্তহীনতা জন্মে। রক্তহীনতার আশু প্রতীকার করা কর্ত্তব্য, নচেৎ নানাবিধ জটিল ব্যাধির উৎপত্তি হইতে পারে।

স্বাস্থ্যের পক্ষে সূর্য্যকিরণ যে কতদূর আবশ্যক তাহা এক কথায় বলা যায় না। গ্রীষ্ম ও শরৎকাল ব্যতিরেকে অন্যান্য সময়ে পরিমিত মাত্রায় সূর্য্যকিরণ সেবনে কল্যাণ সাধিত হয়। আমাদের শাস্ত্রকারগণ সূর্য্যকে আরোগ্যের দেবতা বলিয়াছেন। বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন সূর্য্যকিরণমধ্যস্থ ultraviolet ray স্বাস্থ্যের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক এবং সূর্য্যকিরণ দ্বারা খাদ্যে 'ঘ' ভাইটামিন (D'vitamin)এর অভাব পূর্ণ হইয়া থাকে। রক্তহীন রোগী আবৃতমস্তকে সূর্য্যকিরণে উন্মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ করিবেন এবং তাঁহার গৃহে যথেষ্ট রৌদ্র ও বাতাস প্রবেশের উপায় থাকা চাই। এতদ্ব্যতীত, অভ্যঙ্গপূর্ব্বক ঈষদুষ্ণ অথবা সূর্য্যকিরণতপ্ত জলে স্নান এবং স্নানান্তে শুষ্কবস্ত্র দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ উত্তমরূপে মার্জ্জন করা দরকার, ঘর্ষণ জন্য চর্ম্মের প্রতিক্রিয়া উৎপাদন (reaction) মঙ্গলজনক। এই পুস্তকের আহারবিধি অধ্যায়ে যে সমস্ত বিধিনিষেধের উল্লেখ করা হইয়াছে, তৎপ্রতি সবিশেষ মনোযোগ দিবেন। প্রচুরপরিমাণে জল পান এবং কোষ্ঠশুদ্ধি এই রোগে বিশেষ প্রয়োজন।

পথ্যবিধি—

প্রচুরপরিমাণে ছানাজাতীয় (প্রোটীন্) খাদ্য এ রোগে বিশেষ প্রয়োজন এবং টাট্‌কা তরিতরকারী ও ফল যথেষ্ট পরিমাণে খাওয়া উচিত। মোট কথা, প্রোটীন্ ও ভাইটামিন্—এই দুই উপাদান সম্বলিত খাদ্য ঔষধের কার্য্য করে। পশুদের (যকৃত) মেটেতে সমধিক পরিমাণে ভাইটামিন্ থাকে, অধিকন্তু, ইহা প্রোটীন্‌সম্পন্ন খাদ্য। এজন্য অনেকে কাঁচা মেটে বাটিয়া, লবণ ও লেবুর রস সহযোগে প্রত্যহ প্রাতে খাইবার ব্যবস্থা করেন; ইহাতে আশু অতি উত্তম ফল পাওয়া যায়। ডিমের পীতাংশে লৌহঘটীত লবণ থাকে বলিয়া, ডিমের ঐ পীতাংশ প্রত্যহ প্রাতে কাঁচা সেবন করিলেও আশু ফল লাভ করা যায়। দুধ ও চিনির সহিত মিশাইয়া ডিমের পীতাংশটুকু খাওয়া চলে।

যাঁতায় ভাঙ্গা লাল আটার হাতে গড়া রুটি, দধি, দুগ্ধ, ছানা, ঘোল ও মাখন এবং পুরাতন আতপান্ন এই রোগে উত্তম পথ্য। কাঁচা মাংসের নির্য্যাস (raw meat juice), মাংসের ক্বাথ বা সুরুয়া, ক্ষুদ্রজাতীয় মৎস্য উপকারী। যাঁহারা নিরামিষাশী তাঁহারা দুধ, ছানা ও মাখনের মাত্রা বাড়াইয়া দিবেন। এবং টাট্‌কা ফল বিশেষতঃ কমলালেবু ও আঙ্গুর, যথেষ্ট পরিমাণে খাইবেন।

রক্তহীনতা রোগে, রোগী যাহাতে প্রত্যেক খাদ্যদ্রব্যের সহিত যথেষ্ট পরিমাণে লবণ ব্যবহার করে, সে দিকে লক্ষ্য রাখিবেন।

হাঁপানী

হাঁপানী রোগ প্রথম দেখাদিবামাত্র সুচিকিৎসার ব্যবস্থা না করিলে, প্রায়ই দুরারোগ্য হইয়া পড়ে। নানা কারণে হাঁপানির উদ্ভব হয় এবং ইহার প্রকৃতিও ব্যক্তিভেদে বিভিন্নরূপ হইয়া থাকে। সাধারণতঃ সন্ধ্যার পর এবং রাত্রে ইহার প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। অতএব হাঁপানি রোগী রাত্রে যথাসম্ভব লঘু আহার করিবেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, রাত্রের গ্রহণীয় প্রধানখাদ্য, যথা ভাত বা রুটি, সন্ধ্যার পূর্ব্বে খাইয়া লইলে, রাত্রে শ্বাসের প্রকোপ কম হয়। অতএব, হাঁপানি রোগী মাত্রেই সন্ধ্যার পূর্ব্বে, রাত্রের আহার শেষ করিয়া লইবেন।

যাহাতে বায়ুর অনুলোম হয়, সেরূপ ব্যবস্থা করা একান্ত কর্ত্তব্য। পাকস্থলীর দোষ, এই রোগ উৎপত্তির অন্যতম প্রধান কারণ। সুতরাং হাঁপানি রোগীর সর্ব্বদা আহারবিধি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া উচিত। যাহাতে অম্ল অজীর্ণ প্রভৃতি না হয় এবং প্রত্যহ নিয়মিত কোষ্ঠশুদ্ধি হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখিবেন।

ষোড়শ অধ্যায়

কয়েকটি বিশেষ অবস্থায় খাদ্যের তারতম্য

শরীরের রক্ষণ পোষণ ও বর্দ্ধনের জন্য সচরাচর যে সকল খাদ্যের প্রয়োজন হয় তৎসম্বন্ধে আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি। অবস্থাবিশেষে ঐ সকল উপাদানের কিরূপ তারতম্যের প্রয়োজন হয়—অতঃপর তাহাই আলোচ্য।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদান কালে

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে জননীর খাদ্যের বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। কারণ, একই খাদ্যবস্তু হইতে জননী ও গর্ভস্থ ভ্রূণ বা অঙ্কস্থ সন্তানকে পুষ্টিসঞ্চয় করিতে হয়। এই সময়ে জননীর খাদ্য যথোপযুক্ত না হইলে তাঁহার দেহের ক্ষয় অনিবার্য্য। খাদ্যদ্রব্যের গুণাগুণের উপরে স্তন্যের গুণাগুণ নির্ভর করে। যদি মাতার গৃহীত খাদ্য হইতে স্তন্যের যাবতীয় প্রয়োজনীয় অংশ সংগৃহীত না হয়, তাহা হইলে প্রকৃতি মাতৃদেহের তন্তু সমূহ হইতে ঐ প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ সংগ্রহ করিয়া থাকেন। ফলে, কিছুদিন পরে মাতার অস্বাস্থ্য, এবং মাতার অস্বাস্থ্যের প্রতিক্রিয়া বহুগুণে শিশুর কুস্বাস্থ্যে বা ভ্রূণের অপুষ্টিতে প্রতিফলিত হয়। এইজন্যই গর্ভাবস্থায় এবং যতদিন শিশু স্তন্য পান করে ততদিন জননীর কিছু বিশেষ খাদ্যের প্রয়োজন হয়। এ কথা, অভিভাবকগণ এবং জননীরা স্বয়ং সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন।

গর্ভাবস্থায় কোন কোন রমণী চাখড়ি, পাতখোলা বা পোড়ামাটি ইত্যাদি নানাবিধ অদ্ভুত সামগ্রী খাইয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, চেষ্টাপূর্ব্বক এই কদভ্যাস ত্যাগ করিতে হইবে।

কোন কোন ক্ষেত্রে একটা বিশেষ খাদ্যদ্রব্যের উপর আগ্রহ হইতে দেখা যায়, যেমন কেহ অম্লরস, কেহ লবণরস প্রভৃতির উপর আগ্রহ দেখান। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যাঁহাদের দৈনিক খাদ্যের মধ্যে স্বভাবতঃ প্রয়োজনীয় সর্ব্ববিধ রসের যথাযথ সমাবেশ আছে, তাঁহাদের কোন একটা রসবিশেষের প্রতি উৎকট অভিলাষ জন্মে না। একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে যে এই অভিলাষ প্রাকৃতিক প্রেরণাবশেই হইয়া থাকে। অম্লরস বা ফলের প্রতি ঝোঁক হইলে বুঝিতে হইবে যে গর্ভিনীর রক্ত অতিশয় অম্লধর্ম্মসম্পন্ন (acid) হইয়াছে, এবং উহার স্বাভাবিক ক্ষারধর্ম্ম (alkaline bases) বজায় রাখিবার জন্যই এই অভিলাষ, কারণ, স্বভাবতঃ ফল ও টক্ লেবু প্রভৃতি ক্ষারত্ববর্দ্ধক খাদ্য। কোন কোন গর্ভিনী লবণাক্ত দ্রব্য অধিক পরিমাণে অভিলাষ করিয়া থাকেন। দেহে লবণজাতীয় উপাদানের অপ্রাচুর্য্য হইতেই স্বভাবতঃ এই অভিলাষের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এসব ক্ষেত্রে গর্ভিনীর অভিলাষ সম্ভবমত পূর্ণ করাই উচিত। আমাদের মনে হয় দৈহিক এই প্রয়োজনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াই, শাস্ত্র গর্ভিনীর অভিলাষ পূর্ণ করিতে ভূয়োভূয় কহিয়াছেন।

গর্ভিনীদিগের খাদ্যবস্তুর প্রতি অভিলাষের বিষয়ে আলোচনা করিলে আর একটি বিষয় দেখা যায়। শালিজাতীয় (শ্বেতসার-কার্ব্বোহাইড্রেট) খাদ্যের প্রতি প্রায় কোন গর্ভিনীই তাদৃশ অনুরাগ প্রদর্শন করেন না। বস্তুতঃ গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদান কালে উক্ত শালিজাতীয় উপাদানের মাত্রা কমাইয়া দিয়া প্রোটীন্ গুণ সম্পন্ন (ছানাজাতীয়—আমিষ খাদ্য) এবং স্নেহজাতীয় (ফ্যাট্—ঘৃত, মাখন) খাদ্যের মাত্রা কিছু বাড়াইয়া দেওয়া উচিত। ভ্রূণ-শরীরের গঠনের সহায়তার জন্য ঐ সকল খাদ্যের বিশেষতঃ ফস্‌ফরাস্ ও ক্যালসিয়ামের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। মৎস্য ক্ষুদ্র-জাতীয় মৎস্যই বাঞ্ছনীয়) ডিম, দুধ প্রভৃতি হইতে এই ধাতব ও উপধাতব পদার্থগুলি সংগ্রহ করিতে হয়। এই সকল ধাতব ও উপধাতব পদার্থের

মাত্রা খাদ্যবস্তুতে এতই অল্প যে উপযুক্ত মাত্রায় গ্রহণ করিতে হইলে, অন্যান্য খাদ্যের মাত্রা কিছু কমাইতে হইবে। গর্ভিণীর পক্ষে সম্ভব হইলে প্রত্যহ প্রায় একসের দুগ্ধ পান করা উচিত।

অক্ষুধা, অরুচি, অজীর্ণ প্রভৃতি উপসর্গ অনেক সময় গর্ভাবস্থায় দেখা দিয়া থাকে। অমিত ভোজন এবং অনিয়ম হইতে এই সকল উপসর্গের উৎপত্তি হয়। কিন্তু অনেকেই জানেন না যে খাদ্যবস্তুতে ভাইটামিনের অভাব হইলেও, এই সব উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, "ক" ভাইটামিন্-সম্পন্ন খাদ্য উপযুক্ত পরিমাণে না খাইলে, জননীর স্তন্যে "ক" ভাইটামিনের অপ্রাচুর্য্য ঘটিবে। "ক" ভাইটামিনের অভাবে শিশুদের শারীরিক শীর্ণতা, বুদ্ধিহীনতা রক্তাল্পতা প্রভৃতি ঘটিতে পারে : সুতরাং "ক" ভাইটামিন্ শিশু ও জননী উভয়েরই কতদূর প্রয়োজনীয় তাহা বলাই বাহুল্য। দুগ্ধপোষ্য শিশুকে উপযুক্ত পরিমাণে এই উপাদানে যোগাইতে হইলে, জননীর খাদ্যে "ক" ভাইটামিন পূর্ণ দ্রব্যের পরিমাণ কিছু বাড়াইতে হইবে। (শিশু-খাদ্য অধ্যায় দেখ।)

শরীরের অস্থি-গঠনের জন্য ক্যাল্‌সিয়াম্ ও ফস্‌ফরাস্ নিতান্ত প্রয়োজন এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। খাদ্যবস্তুর অন্তর্গত এই ক্যাল্‌সিয়াম্ বা ফস্‌ফরাস্‌কে (অল্প বা অধিক পরিমাণেই থাকুক) শরীরের কার্য্যে লাগাইতে হইলে, দুইটী বস্তুর প্রয়োজন হয়— (১) "ঘ" ভাইটামিন এবং (২) সূর্য্যের কিরণ। গৃহ-নির্ম্মাণ কার্য্যে শুধু মাল মসলা সংগ্রহ করিলেই হয় না, মিস্ত্রী মজুরকে দিয়া সেই সকল উপাদান কাযে লাগাইতে হয়, তদ্রূপ, অস্থিগঠনকারী ক্যাল্‌সিয়াম্ ও ফস্‌ফরাস্‌কে কার্য্যে লাগাইতে হইলে, "ঘ" ভাইটামিন্ ও সূর্য্যকিরণ চাই।

প্রত্যেক গর্ভিণী ও স্তনদাত্রী জননীর কর্ত্তব্য, প্রতিদিন কিছুক্ষণ সূর্য্য করণ সেবন করা। প্রসূতি ও সন্তানকে যথারীতি রৌদ্র সেবন করানো

এক সময়ে আমাদের দেশে সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। পরিতাপের বিষয়, সভ্যসমাজে এই সুপ্রথাটী ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। সূর্য্যকিরণসেবনে জননীর শরীরে তথা স্তন্যে, "ঘ" ভাইটামিন উৎপন্ন হয়; এ কথা ভুলিলে চলিবে না। শরৎকালে রৌদ্র সেবন বিধেয় নহে, কারণ তাহাতে পিত্তের বৈষম্য হয় এবং সে পিত্তবৈষম্যের ফলভোগ জননী ও শিশু উভয়কেই করিতে হয়। সহরে সাধারণ গৃহস্থ রমণীগণের পক্ষে উপযুক্ত পরিমাণে রৌদ্র সেবনের ব্যবস্থা তাদৃশ নাই। তাই বারংবার সূর্য্যকিরণের সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইল।

কোন্ কোন্ খাদ্যে ক্যাল্‌সিয়াম্ যথেষ্ট আছে—

দুধ, পনির, ছানার জল, ঘোল, ডিমের কুসম, বাদাম, ডাল, সর্ব্ববিধ ফল, সবুজ শাক-পাতা।

কোন্ খাদ্যে ক্যাল্‌সিয়াম্ যথেষ্ট নাই—

চাল, গম, ছোলা, মূলজ দ্রব্য যথা, আলু, মূলা, শালগম, গাজর, কচু, ওল, মানকচু, সাগু, চিনি, মোরব্বা, পশুমাংস।

কোন্ কোন্ খাদ্যে ফস্‌ফরাস্ যথেষ্ট আছে—

দুধ, ঘোল, ডিম, শিম, দাল, বাদাম, গম, বার্লি, ছোলা, পুঁইশাক, মূলা, শশা, গাজর, ফুলকপি, মৎস্য এবং মাংস।

কোন্ কোন্ খাদ্যে ফস্‌ফরাস্ যথেষ্ট নাই—

কলের ছাঁটা চাল, সাদা ধব্‌ধবে ময়দা, এবং মূলজ দ্রব্যাদি যথা—আলু, মূলা, ওল, মানকচু, শালগম, গাজর।

কোন্ কোন্ খাদ্যে লৌহের অংশ আছে—

পশুর মেটে, লালবর্ণের মাংস, ডিম, দাল, পুঁইশাক, লেটুশ, পিঁয়াজ, বিলাতী বেগুণ, তরমুজ, শশা প্রভৃতি।

কোন্ কোন্ খাদ্যে লৌহের অংশ নাই—

কলের ছাঁটা চাল, সাদা ধব্‌ধবে ময়দা, চিনি, জান্তব চর্ব্বি, উদ্ভিজ্জ তৈল।

শরীরে লৌহের অল্পতায় রক্তহীনতা এবং দুর্ব্বলতা জন্মে। শিশু ও প্রসূতির খাদ্যে যথাযথ লৌহের অংশ চাই।

সংক্ষেপে গর্ভিনীর উপযোগী খাদ্য নির্দ্দেশ করিতে গেলে, নিম্নলিখিত খাদ্যগুলিকে নির্দ্দেশ করা যায়—

যথেষ্ট দুধ, ঘৃত, মাখন, ছানা, ক্ষুদ্রজাতীয় মাছ, ডিম, মাংস (বিশেষতঃ মেটে) ফল ও সবুজ শাকশব্জি, এক বেলা ঢেঁকি ছাঁটা চাউলের ভাত, এক বেলা যাঁতায় ভাঙ্গা আটার রুটি। যাঁহাদের বমন, অরুচি, অজীর্ণ প্রভৃতি হয়, তাঁহারা প্রাতে খালিপেটে অথবা রাত্রে শেষ খাওয়ার সময় ঘৃত অথবা তৈলাক্ত পদার্থ, ছানা মাখন, দুধ প্রভৃতি খাইবেন না। ঐ সকল খাদ্য মধ্যাহ্ন এবং সন্ধ্যাকালের জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখিবেন এবং প্রাতে লেবু অথবা কমলা লেবুর রস এবং কিছু কিছু সুমিষ্ট ফল খাইবেন। ইহাতে অরুচির প্রতীকার হইতে পারে এবং অগ্নিবল বৃদ্ধি পাইতে পারে। গর্ভিনীর পক্ষে উপবাস ও রাত্রিজাগরণ বিশেষরূপে নিষিদ্ধ। ভাবপ্রকাশ গ্রন্থে, নিম্নলিখিত বস্তুগুলিকে স্তন্যবর্দ্ধক বলা হইয়াছে,—শালি তণ্ডুল, গোধূম, মাংসের ও ক্ষুদ্র মৎস্যের যূষ, লাউ, নারিকেল, কেশুর পাণিফল, শতমূল, ভূমিকুষ্মাণ্ড এবং রশুন। উক্তগ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বায়ু পিত্ত অথবা কফ—এই ত্রিদোষের কোনটি দূষিত হইলে সেই দোষের লক্ষণ, স্তনদুগ্ধেও প্রকাশ পাইয়া থাকে। ঐরূপ দোষযুক্ত স্তন্যের শোধনার্থে মুগের যূষ, মাংসরস, পটোল প্রভৃতি হিতকর। স্তন্যশোধনার্থে নানাবিধ ওষধির নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, আমরা এস্থলে তাহার উল্লেখ করিলাম না।

স্বতন্ত্র এক অধ্যায়ে শিশুখাদ্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে সে সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইল না।

কায়িক পরিশ্রমে—

কায়িক পরিশ্রমে দেহের অনেকটা উত্তাপ ও তেজ (energy) ব্যয়িত হইয়া থাকে। সুতরাং, শক্তি ও তেজ উৎপাদক দ্রব্য শ্রমজীবিগণের একান্ত আবশ্যক। আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে বলিয়াছি যে, শালিজাতীয় (শ্বেতসার ও শর্করা) এবং স্নেহজাতীয় (ফ্যাট্) খাদ্যদ্রব্য দেহে উত্তাপ ও তেজ উৎপাদন করিয়া থাকে. আমাদের দেশে দরিদ্র শ্রমজীবিগণ প্রধানতঃ শ্বেতসার খাদ্য হইতেই বল সঞ্চয় করে। কৃষকের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ভাত খাওয়াই একান্ত প্রয়োজন।

শালিজাতীয় ও স্নেহজাতীয় খাদ্যকে সাধারণতঃ ইন্ধন-খাদ্য বলা হয়। স্নেহজাতীয় পদার্থ বলিলে, উদ্ভিজ্জ ও জান্তব, উভয়বিধ দ্রব্যই বুঝায়। সুতরাং যাঁহারা মনে করেন যে, শারীরিক পরিশ্রমের কার্য্যে অথবা ব্যায়াম চর্চ্চায়, অতিরিক্ত মাংসাহার প্রয়োজন তাঁহারা ভ্রান্ত। অতিশ্রমে দেহের অতিরিক্ত ক্ষয় হয়, সন্দেহ নাই; এবং সেই ক্ষয়পূরণের জন্য কিছু বেশী পরিমাণে প্রোটীন্ (আমিষজাতীয় খাদ্য) প্রয়োজন। কিন্তু, এই প্রোটীন্ যাঁতায় ভাঙ্গা আটা, দুধ, দধি, ছানা, ঘোল, মাছ, সবুজবর্ণের শাক-সব্জি, পুঁইশাক প্রভৃতি হইতেও সংগ্রহ করিতে পারা যায়। আলু, সর্ব্ববিধ বাদাম, কলাইশুটি, দাল, সাগু, বালি, ঢেঁকী ছাটা চাউল প্রভৃতিতেও কিয়ৎপরিমাণে কার্য্যোপযোগী প্রোটীন্ বিদ্যমান্। অতএব, কায়িকশ্রমের কার্য্য করিতে হইলেই যে মাংসাহার একান্ত প্রয়োজন, তাহা নহে।

আজকাল অনেক বাঙ্গালী ছাত্র ব্যায়ামের প্রতি মনোযোগ দিয়াছেন। অতিরিক্ত মাংসাহারের প্রতি তাঁহাদেরও একটা উৎকট আগ্রহ দেখা যায়। তাঁহারা সচরাচর যে সকল খাদ্য খাইয়া থাকেন, তাহার সহিত উপযুক্ত

পরিমাণে দাল, ছানা বা দুধ সংযোগ করিলে অভীপ্সিত ফললাভ করিবেন। জান্তব চর্ব্বিতে (animal fats) প্রোটীন্ কিছুমাত্র নাই, অতএব মাংসাহার করিতে হইলে চর্ব্বিবিহীন কচি মাংসই প্রশস্ত।

মানসিক শ্রমে—

বাঙ্গালী শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা সাধারণতঃ মস্তিষ্কজীবি, অর্থাৎ, মানসিক শ্রমের দ্বারা দিনপাত করিয়া থাকেন। আরও দেখা যায়, ঐ শ্রেণীর লোকেরা প্রায়শঃ কায়িক শ্রম কিছুই করেন না, এবং এই শ্রেণীর লোকদের মধ্যে অধুনা অজীর্ণ ও বহুমূত্র রোগের প্রাবল্য ঘটিয়াছে। প্রধানতঃ আহারজনিত বৈষম্য হইতেই, এই সকল রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে।

শারীরিক শ্রমের অভাবে দৈহিক ক্ষয় অতি অল্পই হইয়া থাকে। সুতরাং, মস্তিষ্কজীবি ব্যক্তির কোন জাতীয় খাদ্যই বিশেষ পরিমাণে আবশ্যক হয় না। পরিমিত ভোজন এ সকল ক্ষেত্রে নিতান্ত আবশ্যক। অতি ভোজনে ও গুরু ভোজনে শরীরের অনেকটা শক্তি, খাদ্যপরিপাকের ক্রিয়াতে ব্যয়িত হইয়া যাওয়াতে মানসিক ক্রিয়াশক্তির বিঘ্ন ঘটে।

দেহের ক্ষয়ের অল্পতা নিবন্ধন মস্তিষ্কজীবি ব্যক্তির পক্ষে অতিরিক্ত পরিমাণে শালিজাতীয় (শ্বেতসার ও শর্করা—কার্ব্বোহাইড্রেট্) খাদ্য প্রয়োজন হয় না। সুতরাং শ্বেতসারপ্রধান খাদ্যের মাত্রা কমাইয়া যে সকল খাদ্যে মস্তিষ্ক তথা স্নায়ুবিধানের বলাধান হয়, সেই সকল খাদ্য পরিমিত মাত্রায় ব্যবহার্য্য। অতএব, মস্তিষ্কজীবির পক্ষে আমিষজাতীয় খাদ্য (যাহাতে প্রোটীনের মাত্রা বেশী আছে) যথা, মৎস্য, দুধ, ছানা, চর্ব্বিবিহীন মাংস, ডিম প্রভৃতি প্রশস্ত।

প্রৌঢ়বয়সে—

প্রৌঢ়বয়সে আমাদের দেশে অনেকেই, বিশেষতঃ নারীরা স্থূল হইয়া পড়েন। প্রৌঢ়বয়সে এই স্থূলকায়ত্ব অতি ভোজনের প্রত্যক্ষ ফল।

যৌবনের অন্তে আমাদের শরীরের বর্দ্ধন কার্য্য স্থগিত হইয়া যায়। অধিকন্তু শারীরিক শ্রমের অল্পতা হেতু শারীরিক উত্তাপ ও তেজ (energy) কম ব্যয়িত হয়। সুতরাং, এ বয়সে শরীর গঠনকারী এবং উত্তাপ ও তেজো-বর্দ্ধক (শ্বেতসার ও শর্করা এবং স্নেহজাতীয়) খাদ্য কমাইয়া দেওয়া উচিত। অবশ্য যৌবনের ন্যায় প্রৌঢ়বয়সেও নানাবিধ খাদ্যের সংমিশ্রণ প্রয়োজন হয়, তবে যুবাবয়সের তুলনায় মোট আহারের পরিমাণ কমাইতে হইবে। একজন সুস্থকায় যুবক যতটা আহার করে, তাহার দশভাগের সাতভাগ প্রৌঢ় ব্যক্তির পক্ষে যথেষ্ট। মোট কথা, যাহাতে অনাবশ্যক মেদবৃদ্ধি না হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। প্রৌঢ়বয়সে যাঁহাদের শারীরিক ওজন, দেহের উচ্চতা ও বয়সের অনুপাতে কিছু কম থাকে, তাঁহারা সচরাচর একটু দীর্ঘ-জীবি হন। এ কথা জীবনবীমাকারিগণ বলিয়া থাকেন। ফলতঃ প্রৌঢ়বয়স হইতেই আহারবিষয়ে অবহিত হইলে, জীবনের অন্তিমকাল অর্থাৎ বার্দ্ধক্য সুখকর হয়।

সপ্তদশ অধ্যায়

প্রকৃতি বা ধাতুভেদে খাদ্যনির্দ্দেশ

নিজের প্রকৃতির উপযোগী খাদ্যবস্তু গ্রহণ না করিলে, আহার্য্যদ্রব্য হইতে সম্যক্ সুফল পাওয়া যায় না। একইরূপ পুষ্টিকর সুখাদ্য খাইয়া সকলে সমান সুফল পান না। এমন কি, ক্ষেত্রবিশেষে সম্পূর্ণ বিপরীত ফল দেখা যায়। ইহার কারণ কি? প্রকৃতিগত বৈষম্যই ইহার কারণ।

নিজের প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া, প্রোটীন্, ভাইটামিন্ প্রভৃতি সম্পন্ন খাদ্য খাইলেই যে দেহের পক্ষে হিতকর হইবে, এ ধারণা ভ্রমাত্মক। অতএব, এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা প্রয়োজন।

আমরা শাক-সব্জি, ফল, মৎস্য, মাংস প্রভৃতির গুণাগুণ বর্ণনাপ্রসঙ্গে কোন খাদ্যকে বায়ুনাশক বা বায়ুবর্দ্ধক, কোন খাদ্যকে পিত্তকর বা পিত্ত-নাশক ইত্যাদি বলিয়াছি। এ সকল কথার সম্যক্ তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিলে, কোনই লাভ নাই।

আমাদের দেশে সাধারণ লোকে, এমন কি, নিরক্ষর ব্যক্তিরাও, 'বায়ুর ধাত্,' 'পিত্তের ধাত্' কফের ধাত্' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু, এ সকলের যথাযথ লক্ষণ সম্বন্ধে অনেকেই অজ্ঞ।

বায়ু, পিত্ত ও কফ—

মানবদেহ পঞ্চভূতের সমষ্টি। এই পঞ্চভূতের মধ্যে মরুৎ অর্থাৎ বায়ু মানবদেহে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান্। অস্থি, মাংস, মজ্জা, মেদ, রক্ত প্রভৃতি সকল পদার্থে বায়ু অবস্থিত। বায়ুর স্বাভাবিক ধর্ম্ম গতিশীলতা। এই জন্যই দেহমধ্যস্থ বায়ু, রক্তের চলাচল ক্রিয়া (blood circulation) সাধন করিয়া থাকে। রক্তের এই চলাচল ক্রিয়া সম্বন্ধে, পাশ্চাত্য চিকিৎসকেরা প্রাচীনকালে অবগত ছিলেন না, কিন্তু ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ, দেহমধ্যস্থ বায়ুর দ্বারা রক্তের এই চলাচলক্রিয়া সম্পাদনের বিষয় বহুকাল পূর্ব্বেও জ্ঞাত ছিলেন।

দেহের কোন অংশে তাপ প্রয়োগ করিলে, সে স্থানে অন্যান্য অংশ হইতে রক্ত আসিয়া জমে। দেহমধ্যস্থ বায়ুই এই গতি-সংসাধক। তাপ প্রয়োগে স্থানীয় বায়ু প্রসারিত ও লঘু হইয়া কিয়ৎপরিমাণ রক্তসহ শরীরের অন্যান্য দিকে দ্রুত চলিয়া যায়, এবং সে শূন্য স্থান পূর্ণ করিতে অন্যান্য দিক হইতে রক্ত ছুটিয়া আসে। শরীরের কোন অংশে শৈত্য প্রয়োগ করিলে, ঠিক ইহার বিপরীত ফল লক্ষিত হয়; অর্থাৎ শরীরের

অপেক্ষাকৃত উষ্ণ অংশের দিকে উপরি উক্ত বিধানে রক্ত চলিয়া যাওয়াতে শীতল স্থানটী কিয়ৎপরিমাণে রক্তশূন্য (ফ্যাকাশে) হয়।

অতএব বায়ু ব্যতিরেকে রক্তের চলাচল ক্রিয়া সম্পাদিত হয় না। এই বায়ু দ্বারা আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস, কর্ম্ম-প্রচেষ্টা, উদ্যম-উৎসাহ, মল-মূত্রাদির বেগ ও ইন্দ্রিয় সমূহের কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে।

প্রধানতঃ রক্তের চলাচল ক্রিয়ার জন্য যতটুকু বায়ুর প্রয়োজন, দেহে যদি কোন কারণে, তাহার অতিরিক্ত বায়ু সঞ্চিত হয়, তাহা হইলে দৈহিক ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। এ সকল ক্ষেত্রে বায়ুনাশক দ্রব্যাদির দ্বারা বায়ুর অনুলোম সাধন বিহিত।

গর্ভোৎপত্তিকালে, মাতা পিতার শরীরে বায়ু পিত্ত বা কফ যাহার আধিক্য থাকিবে, গর্ভস্থ সন্তান উত্তরকালে সেইরূপ প্রকৃতি পাইয়া থাকে। "শুক্র-শোণিত সংযোগে যো দোষস্ত্বৎকটো ভবেৎ" ইত্যাদি বচন ভাব-প্রকাশ গ্রন্থে আছে। যাহাই হউক, কোন কোন ব্যক্তির দেহে স্বভাবতঃ বায়ুর আধিক্য বা বায়ুপ্রবণতা থাকে। আমরা সেসকল লোককে বায়ু প্রকৃতি সম্পন্ন লোক, অথবা চলিত ভাষায় বায়ুর ধাতের লোক বলি।

পঞ্চভূতাত্মক দেহের অপর একটি উপাদানের নাম তেজ। এই তেজের অপর নাম উত্তাপ। আমাদের দেহের স্বাভাবিক যে উত্তাপ, আয়ুর্ব্বেদের ভাষায় তাহাকে পিত্ত বলে। এই পিত্তের প্রধান কার্য্য দহন; পিত্তের সহায়তায় আমাদের খাদ্যদ্রব্য পরিপাকপ্রাপ্ত হয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মতে, খাদ্য গ্রহণ করার পরে উহার অর্গানিক পদার্থ নিঃশ্বাস বায়ুর অক্সিজেন দ্বারা যে সময় দগ্ধ হইয়া যায়, সেই সময়ে শরীরে তাপ উৎপন্ন হয়। যে সমস্ত দ্রব্য ভোজনে এই তাপের মাত্রা অধিক হয়, আয়ুর্ব্বেদে সাধারণতঃ সেই সকল খাদ্যকে পিত্তকর বলা হইয়াছে। এবং যে সকল খাদ্য দ্বারা এই তাপের আধিক্য নিবারিত হয়, তাহাকে পিত্ত-নাশক দ্রব্য বলা হয়।

পিত্ত বা পাচক অগ্নি যদি বিকৃত না হয়, তাহা হইলে, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রুচি, সৌন্দর্য্য, মেধা ও বুদ্ধি প্রভৃতির আনুকুল্য করিয়া থাকে।

যদি কোন কারণে, দেহের স্বাভাবিক উত্তাপ বা পিত্তের আধিক্য ঘটে, তাহা হইলে, রক্ত দূষিত হইয়া পীড়া জন্মে। পক্ষান্তরে, পিত্ত অস্বাভাবিক রূপে হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে খাদ্যাদি দহন-ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে এবং পরিণামে রোগোৎপত্তি হয়। কোন কোন ব্যক্তির দেহে স্বভাবতঃ পিত্তের কিছু আধিক্য থাকে। আমরা সে সকল লোককে পিত্ত প্রকৃতি সম্পন্ন, অথবা, চলিতকথায় পিত্ত ধাতের লোক বলি।

পঞ্চভূতের অপর একটির নাম অপ্ বা জল। দেহে এই অপের অংশ সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছে। ইহার সাধারণ ধর্ম্ম স্নিগ্ধতা ও কোমলতা। আমাদের অস্থি, মাংস, মজ্জা, মেদ, রক্ত তথা শরীরের সকল অংশে যে সাধারণ স্নিগ্ধতা আছে, তাহাই—আয়ুর্ব্বেদের ভাষায় শ্লেষ্মা বা কফ। আমাশয়ে অবস্থিত শ্লেষ্মা ভুক্তবস্তুকে পিণ্ডাকারে পরিণত করে। এইরূপ শরীরের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত শ্লেষ্মার বিভিন্ন কার্য্য আছে। দেহ ধারণের পক্ষে এই শ্লেষ্মার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান। পক্ষান্তরে শ্লেষ্মার আধিক্য বা স্বল্পতায় দৈহিক পীড়া বা ক্ষতি অনিবার্য্য।

কোন কোন ব্যক্তির দেহে এই স্নিগ্ধতা বা শ্লেষ্মার আধিক্য দেখা যায়। আমরা সাধারণতঃ সেই সকল লোককে শ্লেষ্মাপ্রধান বা শ্লেষ্মাধাতুর লোক বলিয়া থাকি।

বায়ু, পিত্ত ও কফ কুপিত হইলে, শরীরের অনিষ্ট সাধন করে বলিয়া উহাদিগকে ত্রিদোষ বলা হয়। পক্ষান্তরে দেহধারণের জন্য বায়ু, পিত্ত ও কফের প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া উহাদিগকে ধাতু বলা যায়। ধারণ করে বলিয়াই ইহারা ধাতু নামে অভিহিত।

বায়ুপ্রধান ধাতুর নির্দ্দেশক লক্ষণ—

বায়ুপ্রধান ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ রুক্ষ, কৃশ, অল্পনিদ্রাশীল বা নিদ্রা-হীন, অত্যন্ত বাক্যব্যয়ী (বেশী বকে) শিরাবহুল। এই সকল ব্যক্তি স্বল্প কারণেই উত্তেজিত, ভীত, অনুরক্ত বা বিরক্ত হয়েন। এই সকল ব্যক্তি অল্প স্মরণ-শক্তি বিশিষ্ট, চঞ্চল-বুদ্ধি, চঞ্চল-গতি, চঞ্চল-দৃষ্টি এবং ক্ষিপ্রকারি। এই সকল ব্যক্তির গাত্রের রোমাবলী ও মস্তকের কেশ কর্কশ হয়। ইঁহারা শীতসহনে অসমর্থ এবং গমনকালে ইঁহাদের অঙ্গ-সন্ধি সমুহের অস্থির শব্দ শোনা যায়। বায়ুর আধিক্যে মুখের শুষ্কতা এবং জিহ্বায় কষায় আস্বাদ ও মূত্র সচরাচর লালবর্ণের হইয়া থাকে। বায়ু প্রধান ব্যক্তি নিদ্রাকালে আকাশে উড়িতেছেন, এরূপ স্বপ্ন দেখেন।

বায়ুপ্রধান ব্যক্তির উপযোগী ও অনুপযোগী খাদ্য—

যে সকল দ্রব্যে বায়ু কুপিত হইয়া থাকে, তিক্ত কষায় ও কটু (ঝাল) রস বিশিষ্ট খাদ্যাদি, রুক্ষ ও লঘু দ্রব্য (মুড়ি, বিস্কুট, পাঁউরুটি প্রভৃতি) শীতল দ্রব্য ভোজন বর্জ্জনীয়। শুষ্ক শাক, শুষ্ক মাংস, মুগ, মসুর, অড়হর শিম, মটর ছোলা প্রভৃতি দ্রব্য (বিশেষতঃ বর্ষাকালে) পরিত্যাজ্য।

মধুর, অম্ল ও লবণ রসবিশিষ্ট খাদ্যাদি—এবং ঘৃত তৈলাদি স্নেহ-জাতীয় খাদ্য হিতকর।

টাট্কা—মাংস-যূষ, মাষকলাইয়ের দাল এই সকল ব্যক্তির পক্ষে উপযোগী।

আহার্য্য বস্তু উষ্ণাবস্থায় ব্যবহার্য্য।

বায়ুপ্রধান ধাতুতে উপবাস অকর্ত্তব্য।

পিত্তপ্রধান ধাতুর নির্দ্দেশক লক্ষণ—

পিত্তপ্রধান ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ গরম সহ্য করিতে পারেন না। ইহারা ঘর্ম্ম-শীল ও শীতল দ্রব্য প্রিয়। সাধারণতঃ হস্তদ্বয়ে, পদদ্বয়ে এবং

চক্ষুতে দাহ (জ্বালা) ও উত্তাপ থাকে। ইঁহাদের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা অধিক হয়। ইঁহারা পিঙ্গল বর্ণ কেশ ও অল্প লোম বিশিষ্ট এবং ইঁহাদের মস্তকে প্রায়ই টাক্ পড়ে। ইহাঁরা ক্লেশসহনে অক্ষম এবং অভিমানী। ক্রোধ উপস্থিত হইলে, অথবা সামান্ত সূর্য্যকিরণ লাগিলেই,—পিত্তপ্রধান ব্যক্তির চক্ষু সহজেই রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। ইহঁারা প্রায়ই চুলকণা বা চর্ম্মরোগে ভুগিয়া থাকেন। পিত্তপ্রধান ব্যক্তির দেহে অধিক পরিমাণে তিলচিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে। পিত্ত কুপিত হইলে মুখের আস্বাদ তিক্ত, প্রস্রাব পীতবর্ণ ও ঘর্ম্ম দুর্গন্ধযুক্ত হয়। পিত্তপ্রধান ব্যক্তি নিদ্রাকালে স্বপ্নে অগ্নি বা জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ, ফুলের বাগান প্রভৃতি দেখিয়া থাকেন।

পিত্তপ্রধান ধাতুর উপযোগী ও অনুপযোগী খাদ্য—

ক্ষুধার সময়ে না খাইলে এবং কটু, অম্ল ও লবণ রসবিশিষ্ট খাদ্য ও সুরা প্রভৃতি তীক্ষ্ণ দ্রব্য এবং লঘু ও বিদাহী (অর্থাৎ ভাজা) দ্রব্যে পিত্ত কুপিত হয়। তিল তৈল, সর্ষপ শাক, মৎস্য, ছাগ মাংস, মেষমাংস, অম্লরস যুক্ত দধি, দধির মাত, মাখনযুক্ত দধির ঘোল, অম্লফল ও উষ্ণদ্রব্য সেবনে পিত্তের প্রকোপ হইয়া থাকে। ঐ সকল দ্রব্য পিত্তপ্রধান ধাতুতে বর্জ্জনীয়।

মধুর, তিক্ত ও কষায় রসযুক্ত এবং ঘৃতাদি স্নেহজাতীয় খাদ্য পিত্ত-প্রধান ধাতুতে প্রশস্ত। কোন বস্তুই উষ্ণাবস্থায় খাওয়া উচিত নহে। পিত্তপ্রধান ধাতুতে উপবাস (বিশেষতঃ শরৎকালে) প্রশস্ত নয়।

কফপ্রধান ধাতুর নির্দ্দেশক লক্ষণ—

কফপ্রধান ব্যক্তি সাধারণতঃ ধীরস্বভাব, ঘন কেশ বিশিষ্ট, স্থুলকায়, নিদ্রালু ও অলস প্রকৃতির হইয়া থাকেন। স্বল্পাহারসত্ত্বেও ইঁহাদের দেহে মেদ সঞ্চয় হইতে দেখা যায়। ইঁহারা ক্ষুধা তৃষ্ণা বা শারীরিক ক্লেশে তাদৃশ কাতর হন না। শ্লেষ্মা কুপিত হইলে পরিপাক শক্তির হ্রাস

হয় এবং মুখে মিষ্ট ও লবণ আস্বাদ অনুভূত হয়। কফপ্রধান ব্যক্তিগণ নিদ্রাকালে জল বা জলাশয়ের স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন।

কফপ্রধান ধাতুতে উপযোগী ও অনুপযোগী খাদ্য—

মধুর অম্ল ও লবণ রসবিশিষ্ট খাদ্য এবং শীতল, স্নিগ্ধ ও গুরুপাক দ্রব্য ভোজনে শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া থাকে। বার্লি, গোধুম, মাষকলাই বর্ব্বটী, দধি, দুগ্ধ, পায়স, খেচরান্ন, গুড়, জলচর পক্ষীর মাংস, তাল, পানিফল, কলা পেঁপে প্রভৃতি মধুর রসবিশিষ্ট ফল, অপক্ক কুমড়া প্রভৃতি বর্জ্জনীয়।

তিক্ত কষায় কটু দ্রব্য সেবন, স্বল্প ভোজন ও উপবাস কফ ধাতুতে হিতকর। কফপ্রধান ব্যক্তির পক্ষে উষ্ণ দ্রব্য ও নিয়মিত ব্যায়াম বিশেষ আবশ্যক।

মন্তব্য—

উপরি উক্ত ত্রিবিধ ধাতুর নির্দ্দেশক লক্ষণ এবং উপযোগী বা অনুপযোগী খাদ্য-নির্দ্দেশ হইতে পাঠক আপনার প্রকৃতির উপযোগী খাদ্য নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যায়। কিন্তু, অনেক ক্ষেত্রে মিশ্রধাতুর লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যথা,—কফ-পিত্ত-প্রধান, বায়ু-পিত্ত প্রধান ইত্যাদি। এ সকল ক্ষেত্রে উভয়বিধ ধাতুর উপযোগী বা অনুপযোগী খাদ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া একটা মধ্যপথ অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ।

আমাদের দেশে পূর্ব্বে প্রাচীন প্রাচীনরা ধাতু অনুসারে নিজ নিজ খাদ্য নির্ব্বাচন করিতে জানিতেন। আমরা এক্ষণে সে সকল ভুলিতে বসিয়াছি।

আর একটি কথা এস্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"বাল্যে বিবর্দ্ধতে শ্লেষ্মা পিত্তংস্যান্মধ্যমেঽধিকম্।
বার্দ্ধক্যে বর্দ্ধতে বায়ু র্বিচার্য্য তদুপক্রমেৎ॥"

মানব সাধারণতঃ বাল্যে শ্লেষ্মাপ্রধান, মধ্যবয়সে পিত্তপ্রধান এবং বার্দ্ধক্যে বায়ুপ্রধান হইয়া থাকে।

এ সকল বুঝিয়া যদি খাদ্য নির্ব্বাচন করিতে পারা যায়, তবে, স্বাস্থ্য ও আয়ুলাভ সুনিশ্চিত। বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিকগণ খাদ্যের বিশ্লেষণ করিয়া যে সমস্ত গুণাগুণের সন্ধান পাইয়াছেন, সেই অনুসন্ধানলব্ধ জ্ঞানকে সম্পূর্ণরূপে নিজের কাজে লাগাইতে হইলে নিজের প্রকৃতি বা ধাতুর যথেষ্ট পরিমাণ সম্বন্ধে কতকটা জ্ঞান থাকা দরকার। ধরুন, আমাদের বাঙ্গালীর খাদ্যে প্রোটীন্ (ছানাজাতীয়—আমিষপদার্থ) নাই বলিয়া যদি একজন পিত্তপ্রধান ব্যক্তিকে ঘন ঘন মেষমাংস ভোজন করানো যায় তাহা হইলে তাহার উপকারের পরিবর্ত্তে অপকারই হইবে। কারণ, মেষমাংস প্রোটীন্‌সম্পন্ন বটে, কিন্তু, পিত্তপ্রধান ধাতুর অনুপযোগী। এক্ষেত্রে পিত্তনাশক প্রোটীন্ পূর্ণ অন্য খাদ্য (যথা ছানা ইত্যাদি) ব্যবস্থেয়।

অষ্টাদশ অধ্যায়

ঋতুচর্য্যা

গ্রীষ্মচর্য্যা

গ্রীষ্মকালে সূর্য্যের তেজ অতিশয় খরতর হয়, এজন্য কফের হ্রাস ও বায়ুর বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই কারণে এই সময় কটু অর্থাৎ ঝাল ও অম্লরসযুক্ত দ্রব্য ব্যবহার করা বিধেয় নহে। শাস্ত্রে উক্ত আছে—"ভজেন্মধুর মেবান্নং লঘু-স্নিগ্ধ-হিমং দ্রবং সুশীতং তোয়সিক্তান্নং লিহ্যাৎ শক্তূন্ সশর্করান্।" অর্থাৎ এ সময় মধুর, স্নিগ্ধ, শীতল ও দ্রব অন্ন এবং

শর্করা মিশ্রিত সজল শক্তু ভোজন করা উচিত। প্রত্যহ সুশীতল জলে স্নান করা কর্ত্তব্য। পানীয় জল কর্পূর সংযোগে সুগন্ধিকৃত করিয়া কুঁজা, কলসী প্রভৃতি মৃৎপাত্রে রক্ষিত করিবে। ব্যায়াম ও রৌদ্রসেবন এই ঋতুতে বিষবৎ পরিত্যাজ্য। দিবানিদ্রা-দ্বারা কফ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়—এজন্য ইহা অন্য ঋতুতে অহিতকর হইলেও, গ্রীষ্মকালে কফের ক্ষয় নিবন্ধন ইহা দ্বারা বিশেষ অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। এই ঋতুতে মধ্যাহ্ন কালে বিশ্রাম করা একান্ত আবশ্যক।

বর্ষাচর্য্যা

এই সময় আকাশ প্রায়ই মেঘাচ্ছন্ন থাকে, প্রায়ই প্রচুর বারিবর্ষণ হয়। ফলে প্রাণীদিগের শরীরও আর্দ্রতা-প্রবণ হইয়া থাকে। মানব-শরীরে গ্রীষ্মকালের সঞ্চিত বায়ু বর্ষায় প্রকুপিত হওয়ায়, যাহাতে বায়ু প্রশমিত হয়, বর্ষাঋতুতে তাহার চেষ্টা করা উচিত। এই সময় আহারের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। আহারের ব্যতিক্রমে অগ্নিমান্দ্যের সম্ভাবনা অত্যধিক। গুরু ভোজন করিলে এ সময় সহজে পরিপাক হয় না। এজন্য লঘুদ্রব্য আহার করা কর্ত্তব্য। এই সময়ে ঋতুর উপযোগী শয়ন, আহার, শয্যা, পরিচ্ছদ প্রভৃতির প্রতি বিশেষ যত্ন করিবে। বৃষ্টির সময় জলে ভিজিবে না। গাত্র সর্ব্বদা ঢাকিয়া রাখিবে। সমস্ত পানীয় দ্রব্যের সহিত কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে এ সময় সুফলদায়ক হইয়া থাকে। বৃষ্টির জল, কুপ, সরোবর, নদী ও পুষ্করিণীর জল উষ্ণ করিয়া, শীতল হইলে সেই জলে স্নান করা, এ সময় স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী হইয়া থাকে। এ সময়ে সহ্যমত ব্যায়াম করা উচিত।

শরৎ চর্য্যা

বর্ষার শৈত্য অভ্যস্ত হইবার পর, শরীর শরদাগমে সহসা সূর্য্যরশ্মি দ্বারা সন্তপ্ত হওয়ায়, সঞ্চিত পিত্ত প্রায়ই প্রকুপিত হয়। এজন্য

শরৎকালে মধুর ও লঘু, শীতল ও পিত্তনাশক খাদ্য ক্ষুধাকালে যথামাত্রায় ভোজন করিবে। এই সময়—হরিণ-শশকাদির মাংস, শালিধান্য ও যব, তণ্ডুল এবং গোধূম আহার হিতকর। মধ্যে মধ্যে বিরেচন লওয়া আবশ্যক। ডুমুর, মোচা, থোড় ও দেশী কুমড়া প্রভৃতির তরকারী আহার এই কালে প্রশস্ত। এই সময় ঘৃত, মিষ্টদ্রব্য, দুগ্ধ, পরিষ্কৃত চিনি ও গুড় সেব্য। এই সময় রৌদ্রসেবন ও দিবানিদ্রা একেবারে বর্জ্জনীয়। আদা, দধি ও ক্ষারদ্রব্য এবং কোনরূপ ঝাল বা তিক্ত বস্তু এ সময় পরিত্যাজ্য।

শীত ও হেমন্ত চর্য্যা

শীত, বসন্ত ও গ্রীষ্ম—এই তিন ঋতু উত্তরায়ণ ও অবশিষ্ট তিন ঋতু দক্ষিণায়ণ। উত্তরায়ণ কাল প্রতিদিন মনুষ্যগণের বল আদান অর্থাৎ গ্রহণ করিয়া থাকে, এই জন্য উত্তরায়ণ কালের অপর নাম—আদানকাল এবং দক্ষিণায়ণ কাল, মানবদিগকে বল বিসর্জ্জন অর্থাৎ প্রদান করে বলিয়া দক্ষিণায়ণ কালের অপর নাম বিসর্গকাল।

আদানকালে সূর্য্য ও বায়ু অতিশয় তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও রুক্ষ হইয়া পৃথিবীর সৌম্যগুণ নাশ করে। শীতঋতুতে তিক্ত, বসন্তঋতুতে কষায় এবং গ্রীষ্ম, শীত ও হেমন্ত ঋতুতে কটুরস বীর্য্যশালী হয়। এ জন্য আদানকালকে আর্য্যঋষিগণ আগ্নেয় কাল বলিয়াও বর্ণনা করিয়াছেন। বাঙ্গলাদেশে কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাস হেমন্তঋতুর অন্তর্গত। তন্মধ্যে কার্ত্তিক মাসে শরৎকালের ন্যায় আহার্য্যাদি ব্যবহার্য্য এবং অগ্রহায়ণ মাসে শীতচর্য্যার ব্যবস্থা প্রযোজ্য। কার্ত্তিকমাসে গুরুভোজন ও অসময়ে ভোজন সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

শীতঋতুতে মনুষ্যদিগের বল অধিক বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এই সময়—শীত-সংযোগে লোমকূপাদি রন্ধ্র সকল সঙ্কুচিত হওয়ায়

দৈহিক উষ্মা নির্গত হইতে না পারায় কোষ্ঠাগ্নির সহিত মিলিত হইয়া উহাকে বলবান করে। এজন্য এই ঋতুতে যথেষ্ট পরিমাণে ভোজ্যগ্রহণ আবশ্যক। স্বাদু, অম্ল, লবণাস্বাদ দ্রব্য ভোজন করাই এই কালে প্রশস্ত। এই সময় যথেষ্ট ভোজ্য গ্রহণে ধাতুপাক নিবারিত হয়। মেদস্বী পশুর মাংস, গোধূমচূর্ণ, মাসকলাই, ইক্ষুরস, দুগ্ধ, নূতন তণ্ডুলের অন্ন, বসা ও তিল,—এই সমস্ত দ্রব্য সেবন হিতকর। উপযুক্ত পরিমাণে রৌদ্র সেবা, স্বেদগ্রহণ এবং অঙ্গাবরণ ব্যবহার এইকালে কর্ত্তব্য।

কটু, তিক্ত ও কষায়রসযুক্ত জল, লঘুপাচ্য ও বায়ুবর্দ্ধক দ্রব্য ভোজন এবং দিবানিদ্রা প্রভৃতি এই কালে পরিত্যাজ্য। সকল প্রকার মিষ্টান্ন ভক্ষণ এবং স্নান, পান, আচমন ও শৌচাদি কার্য্যে ঈষদুষ্ণ জল ব্যবহার এই ঋতুতে হিতকর।

বসন্তচর্য্যা

শীতকালে সঞ্চিত শ্লেষ্মা বসন্তকালে কুপিত হইয়া পাচকাগ্নিকে দূষিত করে। তজ্জন্য বসন্তকালে বহুবিধ শ্লেষ্মজ রোগ জন্মিবার বিশেষ সম্ভাবনা। সুতরাং এই সময় বমনাদিদ্বারা শ্লেষ্মা বহির্গত করিয়া দেওয়া উচিত। এই কালে লঘুপাক, রুক্ষবীর্য্য, কটু-তিক্ত-কষায়-লবণরসযুক্ত অন্নাদি, হরিণ প্রভৃতির লঘু মাংস আহার উপকারী। গুরুপাক, স্নিগ্ধ এবং অম্ল ও মধুর রসযুক্ত দ্রব্য ভোজন ও দিবানিদ্রা প্রভৃতি এই কালে অনিষ্টজনক।

মন্তব্য

যাঁহারা ঋতুচর্য্যার সকল নিয়ম পালন করিতে অক্ষম, তাঁহাদের জন্য সংক্ষেপে এই কয়টি সাধারণ নিয়ম সঙ্কলন করিয়া দিলাম :—

(১) অম্ল দ্রব্য—অম্বল, চাটনি প্রভৃতি শীতল হইবার পূর্ব্বে, অল্প গরম থাকিতে থাকিতেও, খাইতে নাই। এরূপ অম্বল সেবন কারণে পিত্ত অতিশয় প্রকুপিত হয়। বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য কোন ঋতুতে অম্লরস হিতকর নহে। পাতি বা কাগজি লেবু প্রভৃতি অম্লরসাত্মক হইলেও, উহারা বিপাকে (re-action) মধুররস, অর্থাৎ উহাদের re-action বা প্রতিক্রিয়া অম্লত্ব-জনক নহে (acid) নহে। সুতারং লেবু সেবন হিতকর।

(২) তিক্ত দ্রব্য—তিক্ত দ্রব্যের মধ্যে পল্‌তা হিতকর। অন্যান্য তিক্ত দ্রব্য অল্পবিস্তর রক্তনাশক। গ্রীষ্ম ও শরৎকালে তিক্ত দ্রব্য সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। বসন্তকাল তিক্তদ্রব্য সেবনের প্রশস্ত সময়; বর্ষা ও শীতঋতুতে অল্পপরিমাণে সেবন করা চলিতে পারে। বসন্তঋতুতে প্রত্যহ উচ্ছে অথবা উচ্ছেবীজ খাওয়া ভালো। এতদ্ব্যতীত বসন্তকালে পল্‌তা, করোলা এবং অল্পমাত্রায় নিম খাওয়া চলিতে পারে। নিম খাইয়া, অথবা অন্য কোন তিক্তবস্তু অধিক পরিমাণে সেবন করার পর, সেই তিক্ত দ্রব্য পরিপাক না হওয়া পর্য্যন্ত, দুগ্ধ অথবা কোন মিষ্টদ্রব্য খাওয়া উচিত নয়।

(৩) মিষ্টদ্রব্য—বসন্তকাল ব্যতীত অপর সকল ঋতুতে মিষ্ট দ্রব্য সেবনে উপকার হয়। শরৎকালে অধিক পরিমাণে (অবশ্য নিজের পরিপাক-শক্তি অনুযায়ী) মিষ্টদ্রব্য খাইলে ক্ষতি নাই, বরং উপকার হয়।

(৪) কটু বা ঝাল দ্রব্য—লঙ্কার ঝাল অনিষ্টকর। যদিও লঙ্কাতে "ক" ভাইটামিন্ অল্পমাত্রায় আছে, তথাপি লঙ্কার পরিবর্ত্তে আদা বা গোলমরিচ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। শরৎ ও গ্রীষ্ম কালে আদা পরিত্যাজ্য।

ঊনবিংশ অধ্যায়

পথ্য প্রস্তুত প্রণালী

এরারুট—এরারুটে নানারূপ শ্বেতসারজাতীয় ভেজাল চলিতেছে। সুতরাং দেখিয়াশুনিয়া উৎকৃষ্ট এরারুট সংগ্রহ করা দরকার। প্রথমে অল্প একটু ঠাণ্ডা জলে **৩ চামচ** (চায়ের চামচ) এরারুট উত্তমরূপে মিশাইয়া লইবে। পরে **আধসেরর** ফুটন্ত জল উহাতে অল্পে অল্পে ঢালিয়া বেশ করিয়া মিশাইয়া লইবে, যেন ডেলা না বাধে। তৎপরে আধছটাক চিনি বা মিছরী যোগ করিয়া, মৃদুজ্বালে **২।৩ মিনিট ফুটাইয়া** লইবে। **শটী**—উপরি উক্ত প্রকারে প্রস্তুত করিতে হয়, তবে জ্বালটা **৭ মিনিট** দিতে হইবে।

বার্লি—অল্প একটু ঠাণ্ডা জলে **দুই চামচ** (চায়ের চামচ) বার্লি উত্তমরূপে মিশাইয়া লইয়া, পরে আধসের জলে গুলিয়া **২০ মিনিট** কাল জ্বাল দাও। যত বার পথ্য দিতে হইবে, ততবারই নূতন প্রস্তুত করিয়া দেওয়া দরকার।

সাগু—**দুই চামচ** (চায়ের চামচ) সাগুদানা প্রথমে ভাল করিয়া ধুইয়া লইবে. পরে **আধসের** জলে **১ ঘণ্টা** ভিজাইয়া রাখিবে। পরে, মৃদুজ্বালে চাপাইয়া দিয়া, **১ পোয়া** অবশেষ থাকিতে ২ চামচ চিনি বা মিছরি চূর্ণ উত্তমরূপে মিশাইয়া নামাইয়া লইবে। দুধসাগু প্রস্তুত করিতে হইলে, ঐ রূপে প্রস্তুত সাগুর সহিত উষ্ণ দুধ মিশাইয়া লইতে হয়। দুধের পরিমাণ সম্বন্ধে চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া উচিত। আজ কাল সাগুতে 'ক্যাসাভা' নামক দুষ্পাচ্য পদার্থ ভেজাল দেওয়া হয়, সুতরাং ক্রয়কালীন সাবধান হইবে।

ভাতের মণ্ড—আধসের জলে উত্তমরূপে ধৌত এক ছটাক

পুরাতন চাউল দিয়া, মৃদুজ্বালে ফুটাইতে ফুটাইতে জল যখন বেশ কমিয়া যাইবে, তখন নামাইয়া জ্বলন্ত চুল্লীর পাশে ১ ঘণ্টা রাখিয়া দিবে। বলা বাহুল্য, জ্বাল দিবার সময় মধ্যে মধ্যে নাড়া দরকার, নচেৎ তলা ধরিয়া যাইবে। পরে, গরম থাকিতে থাকিতে, মোটা কাপড়ে ছাঁকিয়া লইলে ভাতের মণ্ড পাওয়া যাইবে। ঐ মণ্ডে আবশ্যক মত লবণ ও লেবুর রস অথবা চিনি মিশ্রিত করিয়া রোগীকে দেওয়া যাইতে পারে।

খই মণ্ড—একপোয়া গরম জলে দুই মুঠা টাট্‌কা খই পনের মিনিট ফেলিয়া রাখিবে। পরে উত্তমরূপে উনানে ফুটাইয়া লইয়া, শীতল হইবার পূর্ব্বে মোটা কাপড়ে বেশ করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। ফুটাইবার সময় বেশ করিয়া নাড়িবে, যেন তলা না ধরে এবং ঐ সময় দুই চামচ চিনি যোগ করিবে।

চিঁড়ার মণ্ড—উত্তমরূপে ধৌত দুই চামচ (বড় চামচ) চিঁড়া এক পোয়া গরম জলে ১ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখ। উহা উত্তমরূপে নরম হইলে, আধপোয়া গরম জল মিশাইয়া পাঁচ মিনিট উনানে ফুটাইয়া লইবে। পরে, শীতল হইবার পূর্ব্বে মোটা কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। উহার সহিত পরিমাণমত লবণ, লেবুর রস অথবা চিনি মিশাইয়া রোগীকে দিবে।

মানমণ্ড—রৌদ্রে উত্তমরূপে শুষ্ককরা মানকচুর চাকা হামান-দিস্তায় উত্তমরূপে চূর্ণ-করতঃ, পাতলা পরিষ্কার কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। ঐ চূর্ণের আধছটাক এবং একছটাক পুরাতন আতপ চাউলের চূর্ণ একত্রে মিশাইয়া একটা পাত্রে কিছুক্ষণ অল্প পরিমাণ ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া রাখ। পরে উহার সহিত ৩ পোয়া জল, ৩ পোয়া খাঁটি দুধ ও একছটাক চিনি মিশাইয়া মৃদুজ্বালে

উত্তমরূপে ফুটাইয়া গাঢ় করিবে। শীতল হইলে, রোগীকে খাইতে দিবে।

দালের যূষ—একপোয়া সোনামুগ বা মসুরের দাল উত্তমরূপে ধুইয়া, কিছু লবণ, ২।১ খানি তেজপাত এবং অল্প কয়েকটা আস্ত ধনিয়া মিশাইয়া একসের জলে **এক ঘণ্টা** সিদ্ধ কর। পরে নামাইয়া ছাঁকিয়া লও।

পোরের ভাত—ঘুঁটের জ্বালে, ছোট মাটির হাঁড়িতে যথা পরিমাণ পুরাতন চাল ও জল চড়াইয়া দাও। চালগুলি উত্তমরূপে সিদ্ধ হইয়া যখন গলিয়া যাইবার মত হইবে, তখন নামাইয়া লও এবং গরম থাকিতে থাকিতে রোগীকে বা শিশুকে খাইতে দাও।

ছানার জল—ফুটন্ত দুধ নামাইয়া, তাহাতে পাতি বা কাগজি লেবুর রস যোগ করিলে ছানা কাটিয়া যায়। উহা পরিষ্কৃত বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইলেই ছানার জল পাওয়া যাইবে। এনামেল বা পাথরের পাত্রে ছানার জল করিবে।

বিংশ অধ্যায়

আমাদের দৈনিক খাদ্যব্যবস্থায় দোষ ও প্রতীকার

আমরা নিত্যব্যবহার্য্য খাদ্যদ্রব্যের গুণাগুণ বিক্ষিপ্তভাবে নানা অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি। উপসংহারে, সাধারণ বাঙ্গালী প্রত্যহ যাহা খাইয়া থাকেন, তাহার মধ্যে প্রধানতঃ কি কি দোষ ঘটে, সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিয়া, গ্রন্থ সমাপ্ত করিব।

আমিষ (প্রোটীন্) খাদ্যের অল্পতা—আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকে দুইবেলা সাধারণতঃ ভাত খাইয়া থাকেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, চাউলের ন্যায় শ্বেতসারপ্রধান খাদ্য প্রধানতঃ ইন্ধন-খাদ্য (fuel food) রূপে গণ্য। বস্তুতঃ, কায়িক-শ্রমসাধ্য কার্য্য যাঁহাদিগকে করিতে হয়, তাঁহাদের পক্ষে, ভাতের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর, সহজলভ্য ও সুপাচ্য ইন্ধন-খাদ্য নাই বলিলেই চলে। খাদ্যতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, ত্রিশবৎসর-বয়স্ক সুস্থকায় যুবকের পক্ষে সারাদিনে মোট ৭৷৷৹ হইতে ৮৷৷৹ ছটাক নির্জ্জলা শ্বেতসার প্রয়োজন। শ্রমজীবি বাঙ্গালী সাধারণতঃ ইহাপেক্ষা অধিক পরিমাণে শ্বেতসার গ্রহণ করিয়া থাকে। তাহাদের ততটা ক্ষতি হয় না। কিন্তু, সাধারণ মধ্যবিত্ত মস্তিষ্কজীবি শিক্ষিত বাঙ্গালীর পক্ষে অতিরিক্ত শ্বেতসারের প্রয়োজন নাই, বরং, আমিষজাতীয় (প্রোটীন্) খাদ্যের আবশ্যকতা আছে, এ কথাও আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

খাদ্যতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, একজন পূর্ণবয়স্ক যুবকের পক্ষে প্রত্যহ ১৷৷৹ ছটাক পরিমাণ নির্জ্জলা ছানা-জাতীয় সারপদার্থ (প্রোটীন্) প্রয়োজন। অন্ততঃ জগতের কোন বলবান্ জাতির সাধারণ যুবক, ইহাপেক্ষা কম পরিমাণ প্রোটীন্ প্রত্যহ আহার করে না।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, চাউলে প্রোটীন্ আছে কি না? নিতান্ত অল্প মাত্রায় চাউলে প্রোটীন্ আছে বটে, কিন্তু, গুণের দিক দিয়া, ঐ প্রোটীন্ মানবশরীরের উপযোগী প্রোটীন্ নহে। গমেও প্রোটীনের মাত্রা অল্প, কিন্তু, গমের প্রোটীন্, চাউলের অন্তর্গত প্রোটীন্ অপেক্ষা, গুণে উৎকৃষ্টতর এবং গমে চাউলের অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণে উহা বিদ্যমান্। সুতরাং, মাত্রার দিক দিয়া প্রোটীনের বিচার করিতে গেলে, সাধারণ বাঙ্গালীর পক্ষে, এক বেলা আটা (যাঁতায় ভাঙ্গা লাল আটা) আহার প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। চাউল তথা আটায় প্রোটীনের

যেটুকু অভাব আছে, সে অভাব পূর্ণ করিতে হইলে, উপযুক্ত পরিমাণে দাল (মোট দৈনিক দুই ছটাক) সবুজ বর্ণের শাক্-সব্জি, প্রায় তিন পোয়া দুধ কিম্বা ছানা, দধি,—অথবা, মাংস বা ডিম প্রয়োজন।

কয়জন বয়স্কবাঙ্গালী উপযুক্ত পরিমাণে দুধ, দধি বা ছানা, কিম্বা দাল খাইয়া থাকেন? দুধের দুর্ম্মূল্যতা ও ভেজাল দুধসেবনের অন্তরায়। ছানাতেও যথেষ্ট ভেজাল চলিয়াছে। এমতাবস্থায়, প্রোটীন্‌সম্পন্ন সহজলভ্য বিশুদ্ধ খাদ্য নির্দ্দেশ করিতে হইলে, বোধ হয়, দাল, মাংস বা ডিমের উল্লেখ করা যাইতে পারে। পুরাতন হইলে দালে উপযোগী প্রোটীনের মাত্রা কমিয়া যায়, এবং উহা সুসিদ্ধ হয় না। যাহাই হইক, নূতন দাল সংগ্রহ করা কঠিন নয়। যদি দেখিয়া লইতে পারা যায়, তাহা হইলে, উৎকৃষ্ট মাংস ও ডিম সংগ্রহ করাও সহজ। এ সকল জিনিষে ভেজাল চলে না। নিজের প্রকৃতি ও রুচি অনুসারে প্রত্যেক বাঙ্গালীরই কর্ত্তব্য —মধ্যে মধ্যে মাংস ভোজন করা।

যাঁহারা নিরামিষাশী, তাঁহারা দালের মাত্রা বাড়াইয়া দিবেন। বাঙ্গালী সচরাচর দাল খুবই কম খাইয়া থাকে। দালের উপকারিতা বুঝিলে, এ অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিবে বলিয়া আশা করা যায়। দুর্ব্বল বাঙ্গালী পশ্চিমভারতের দালভোজী বলবান্ জাতিদিগের আহারের দিকে লক্ষ্য করিলে, দালের উপকারিতা বুঝিতে পারিবে।

আমিষ-আহারীই হউন, অথবা নিরামিষভোজীই হউন, উদ্ভিজ্জ প্রোটীন্ সকলেরই আবশ্যক। অধিকন্তু স্বাস্থ্যের অনুরোধে, সবুজ বর্ণের শাক্-পাতার অন্তর্গত খাদ্যপ্রাণ বা ভাইটামিন্ আহার সকলেরই সমভাবে কর্ত্তব্য। যদি আটার পরিবর্ত্তে, দুইবেলা ভাত খাইতে হয়, তাহা হইলে দুধ এবং শাক্-পাতার দরকার আরও বেশী। শাক্-পাতা, দুধ, ভাত, মাছ খাইয়াই বাঙ্গালী একদিন দেহে ও মনে সমুন্নত ছিল। আজ, অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে,—খাঁটিদুধ দুর্ল্লভ ও দুর্ম্মূল্য;—

মাছ সাধারণ গৃহস্থ সংসারে হোমিওপ্যাথিক ডোজে ব্যবহৃত হয়। তাই, সকলদিকে লক্ষ্য রাখিয়া, আমরা সাধারণ বাঙ্গালীকে দাল অথবা মাংস ভোজনের মাত্রা বাড়াইতে অনুরোধ করি। যদি টাট্‌কা মাছ, খাঁটি দুধ, বিশুদ্ধ ছানা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে, অতিরিক্ত শ্বেতসারের পরিবর্ত্তে, ঐসকল দ্রব্য যথাপরিমাণে বাড়াইতে হইবে। শুধু শারীরিক স্বাস্থ্য নহে, মানসিক শক্তির বিকাশে এই সকল খাদ্য অদ্বিতীয় এবং এ দেশের লোকের ধাতুর উপযোগী।

স্নেহ জাতীয় (ফ্যাট্) খাদ্যের অল্পতা—আমরা দেখিতেছি যে, বর্ত্তমানে আমাদের দৈনিক প্রধান খাদ্য বস্তুতে প্রোটীনের ব্যবস্থা কিছু কম। অতঃপর (ফ্যাট্) স্নেহজাতীয় পদার্থ আমাদের দৈনিক খাদ্যে কিরূপ আছে, তাহা দেখা দরকার। খাদ্য-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, একজন পূর্ণবয়স্ক যুবকের পক্ষে, প্রত্যহ ১ এক ছটাক নির্জ্জলা মাখনজাতীয় সারপদার্থ প্রয়োজন। এস্থলে, অনেকে মনে করিতে পারেন যে, প্রত্যহ এক ছটাক খাঁটি মাখন খাইতে পারিলে, উপযুক্ত ফল পাওয়া যাইবে। বস্তুতঃ তাহা নহে, মাখন যদি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধও হয় তথাপি তাহার মধ্যে শতকরা দশ ভাগ জল প্রভৃতি অন্যান্য উপাদান থাকিবে। ঐ বাকী শতকরা দশ ভাগ স্নেহজাতীয় সারবস্তু সংগ্রহ করিতে হইলে, অন্যান্য বহুবিধ খাদ্যেরও প্রয়োজন হইবে। যাঁহারা বাঙ্গালীর খাদ্য-উপাদানের প্রতি একটু মনোযোগ দিবেন, তাঁহারাই দেখিতে পাইবেন, বাঙ্গালীর দৈনিক খাদ্যে মাখনজাতীয় সারবস্তু কিছু কম আছে।

প্রথমতঃ ভাতে স্নেহজাতীয় (মাখনজাতীয়) উপাদানের মাত্রা নগণ্য বলিলেই হয়। আটাতে স্নেহজাতীয় উপাদান চাউল অপেক্ষা অনেক অধিক আছে, কিন্তু, তাহাও পর্য্যাপ্ত নহে। এইজন্য এই সকল বস্তুর সহিত ঘৃত, মাখন, তৈলাক্ত মৎস্য, অথবা উদ্ভিজ্জ তৈল সংযোগ করা হয়,

বা করা নিত্যন্ত প্রয়োজন। এ সকল দ্রব্যের মধ্যে ঘৃতই সর্ব্বোৎকৃষ্ট; এই জন্যই আমাদের শাস্ত্র বলিয়াছেন, "ঘৃতহীনং কুভোজনং"। উৎকৃষ্ট বিশুদ্ধ ঘৃত সাধারণ-জন-সুলভ নহে। মাখনেও অত্যধিক পরিমাণে ভেজাল চলিয়াছে। অতএব, কঃ পন্থাঃ ?

তৈলাক্ত মৎস্য বা মাছের তেলের দ্বারা এ অভাব কতকটা পূর্ণ হইয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গবাসী সাধারণ লোকে এই উপায়ে যথাপরিমাণে জান্তব স্নেহজাতীয় খাদ্য খাইয়া থাকে।[১] কিন্তু, পশ্চিমবঙ্গবাসিগণ প্রধানতঃ উদ্ভিজ্জ তৈলের উপরে নির্ভর করে। প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল যে, অধুনা ভেজটেবিল ঘৃত নামে পরিচিত উদ্ভিজ্জ তৈল সমূহ খাদ্যপ্রাণ-বিবর্জ্জিত।

স্নেহজাতীয় খাদ্যবস্তুর মধ্যে, বাঙ্গালীজাতি সরিষার তৈল আহার্য্য বস্তুতে ব্যবহার করিয়া থাকেন। এবং মোটের উপর বাঙ্গালী জাতির স্নেহপান, এই সরিষার তৈল পানে পর্য্যবসিত হইয়াছে। সরিষার তৈল ছানাজাতীয় উপাদান বর্জ্জিত। সবুজবর্ণ শাকপাতা ও মৎস্যের সংযোগে সরিষার তৈলের প্রোটীনের এই অভাব পূর্ণ করিতে পারা যায় বটে কিন্তু, আভ্যন্তরীন সেবনে সরিষার তৈলের নিজের বিশেষ কোন পুষ্টিকারিতা শক্তি নাই। সুতরাং বাঙ্গালীর এই প্রধান স্নেহজাতীয় খাদ্যের উপযোগীতা কিছু কম।

সাধারণতঃ জান্তব এবং উদ্ভিজ্জ তৈল—এই দুই পদার্থ হইতে স্নেহ জাতীয় উপাদান সংগ্রহ করা হয়। ইহার মধ্যে জান্তব ঘৃত ও মাখন, প্রোটীনের বিদ্যমানতা হেতু, সরিষার তৈল অপেক্ষা প্রশস্ততর। অন্যান্য খাদ্য হইতেও, স্নেহজাতীয় উপাদান সংগ্রহ করা চলে, যথা— ডিমের কুসুম, ছাগের মজ্জা, দাল, ফুলকপি, পুঁইশাক, ঢ্যাঁড়স, ঝুনা নারিকেলের শাঁস, চীনাবাদাম প্রভৃতি হইতে। এইসকল খাদ্য হইতে স্নেহজাতীয় ও ছানাজাতীয়, উভয়বিধ উপাদানই এবং

ভাইটামিন্ অল্পবিস্তর পাওয়া যায়। একসময়ে এ দেশের লোক জলযোগে নারিকেলের শাঁস যথেষ্ট ব্যবহার করিত। বর্ত্তমানে সে সুপ্রথা উঠিয়া গিয়া, সৌখীন খাবাবের চলন হইয়াছে! অনেকক্ষেত্রে রুচিবিকারই, আজকালকার দিনে মার্জ্জিত রুচির লক্ষণ বলিয়া গণ্য !!

যাঁহাদের পক্ষে উপযুক্ত পরিমাণে বিশুদ্ধঘৃত বা মাখন সংগ্রহ করিবার উপায় নাই, এবং যাঁহারা মৎস্য বা ডিম খাইতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহাদের পক্ষে স্নেহজাতীয় খাদ্যের দীনতা পূর্ণ করিবার জন্য সারবান সব্জি সকল প্রয়োজন। কিন্তু, তাহাতেও সম্যক্ পুষ্টি (বিশেষতঃ শিশু ও বর্দ্ধনশীল 'বালকদিগের) সম্ভব নহে বলিয়া, উপযুক্ত পরিমাণে দুগ্ধ সেবন কর্ত্তব্য।

অন্যান্য উপাদানের অপচয়—আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আহারের সময় আমরা যে সাধারণ লবণ ব্যবহার করিয়া থাকি, তদ্ব্যতিরেকে, আরও কয়েকটি ধাতব ও উপধাতব পদার্থ আমাদের দেহে প্রয়োজন হইয়া থাকে, যথা—ক্যাল্সিয়াম্, ফস্ফরাস্, লৌহ ইত্যাদি। আমরা সচরাচর' যে সকল খাদ্য খাইয়া থাকি, তাহা হইতেই এই সকল উপাদান সংগৃহীত হয়। কিন্তু, অভ্যাসের দোষে, বা অজ্ঞতার ফলে, কিম্বা সৌখীনতার মোহে, খাদ্যবস্তুর অন্তর্গত এই অত্যাবশ্যক উপাদানগুলির আমরা যথা অপব্যয় করিয়া থাকি। যখন এ দেশে চাউলের কল অথবা ময়দার কল ছিল না, তখন এসব বিষয়ে এতটা মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন হইত না। কিন্তু, যখন হইতে ঢেঁকিছাঁটা চাউলের পরিবর্ত্তে কলে ছাঁটা পালিশ করা চিক্কণ চাউলের প্রচলন হইয়াছে, যখন হইতে যাঁতায় ভাঙ্গা লাল আটার পরিবর্ত্তে কলের চিত্তাকর্ষক ধব্‌ধবে সাদা ময়দার আদর বাড়িয়াছে, তখন হইতেই এই অন্ন ও ময়দাভোজী জাতির মধ্যে নানাবিধ দৈহিক অনিষ্টের সূত্রপাত হইয়াছে।

ক্যাল্‌সিয়াম্‌, ফস্‌ফরাস্‌ প্রভৃতি উপাদানগুলি, চাউল এবং গমের খোসার বা আবরণের সন্নিহিত প্রদেশে থাকে। সুতরাং, চাউল অতিরিক্ত ছাঁটার ফলে, বা গমের খোসা প্রভৃতি কলে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়া সাদা ময়দা নিষ্কাশনের ফলে, চাউল এবং ময়দা হইতে ঐ সকল উপাদান অন্তর্হিত হইয়া যায়। পক্ষান্তরে, আমরা ভাইটামিন্‌ অধ্যায়ে বলিয়াছি যে, ঠিক এই উপায়ে চাউল এবং গমের ভাইটামিন্‌ নষ্ট হয়।

যদি কলে ছাঁটা চাউল পালিস করা না হয়, তাহা হইলে, তাহার উপরের আবরণে কদাচিৎ ভাইটামিন্‌ ও ক্যাল্‌সিয়াম্‌ প্রভৃতি থাকার কিছু সম্ভাবনা থাকিতে পারে। কিন্তু নিঃশেষে ফেন গালিয়া খাওয়ার ফলে, ঐ প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি খাদ্য হইতে নির্গত হইয়া যায়। অন্যান্য খাদ্যবস্তর ভাইটামিন্‌ আমরা কি ভাবে নষ্ট করিয়া খাই, তাহা, আমরা ভাইটামিন্‌ অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং বাহুল্যভয়ে এখানে উল্লেখ করিলাম না।

টাট্‌কা ফল হইতে উপরি উক্ত প্রয়োজনীয় লবণজাতীয় উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয়, আমাদের দৈনিক খাদ্য ব্যবস্থায় ফলের পরিমাণ শোচনীয়রূপে কমিয়া যাইতেছে। বৈজ্ঞানিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে প্রত্যহ অর্দ্ধছটাক নির্জ্জলা লবণজাতীয় সারপদার্থ প্রয়োজন। সাধারণ বাঙ্গালী যেভাবে ভাত খাইয়া থাকে এবং তাহার দৈনন্দিন খাদ্য ব্যবস্থায় ফলাদির মাত্রা এতই অল্প যে, আমাদের সন্দেহ হয়, বাঙ্গলীর খাদ্যে ক্যাল্‌সিয়াম্‌, ফস্‌ফরাস্‌ লৌহ, প্রভৃতির মাত্রা দিন দিন হ্রাস পাইতেছে।

	জল	ছানাজাতীয়	মাখনজাতীয়	শর্করাজাতীয়	লবণজাতীয়	পরীক্ষক
াউল (দেশী)	৯·৪	৬·৬৯	·১৫	৮৩·৩	·৭৬	মেডিকেল কলেজ
ঐ (বালাম)	১২·৫	৭·৫	·৪২	৭৮·৪৯	·৭৪	ডাঃ শশীভূষণ ঘোষ
ঐ (পাটনাই)	১০·৮২	৭·৯২	১·২৮	৭৮·২৩	১·২	ডাঃ জে, এন্ মৈত্র
ঐ বাঁকতুলসী(আতপ)	১২·৪	৬·৮৩	·৭	৭৯·২	·৬৭	সায়েন্স এসোসিয়েসন
ঐ বাঁকতুলসী (সিদ্ধ)	১১·০৬	৬·৭	·৯	৮০·১	·৬৮	”
ঐ (বোম্বাই)	১০·৮৩	৯·১০	১·২৩	৭৭·১৩	·৮৬	ডাঃ জে, এন্, মৈত্র
ঐ দাদখানি (পুরাতন)	১১·০	৫·৪	·৫	৮২·২	·৮২	ডাঃ শশীভূষণ ঘোষ
ঐ (চিনিশক্কর)	১২·০	৬·৭	·১৬	৮০·৩৫	·৪০	”
ঐ (ব্রহ্মদেশীয়)	১০·৩২	৬·৮৩	·৮২	৭৯·৮০	·৮০	ডাঃ জে, এন মৈত্র
মুড়ি	১০·১	৫·৯	·৩	৮২·৪	১·৩	স্বাস্থ্যসমাচার পরীক্ষাগার
চিড়া (ভাজা)	৮·২	৯·২	·১	৭৪·২	৩·৩	ডাঃ চুণীলাল বসু
খই	...	৫·৭	...	৫০·০	...	মেডিকেল কলেজ

দাল	জল	ছানাজাতীয়	মাখনজাতীয়	শর্করাজাতীয়	লবণজাতীয়	পরীক্ষক
দাল (গড়ে)	১১·৩	২৩·৫	২·২৯	৫৫·৯	৭·১	পার্কস্
সোনামুগ	১১·৪	২৩·৮	২·০	৫৪·৮	৯·০	ওয়ার্ডেন, ডিমক্ ও হুপার
ভাজা মুগের দাল	৫·১	২৫·৫	২·৭	৫৪·১	১০·২	ঐ
কৃষ্ণ মুগ	১০·৮	২২·২	১·৪	৫৫·৫	৫·৮	ডাঃ চুণীলাল বসু
মসুর	১১·৮	২৫·১	১·৩	৫৮·৪	৩·৪	ওয়ার্ডেন, ডিমক্ ও হুপার
অড়হর	১৩·৩	১৭·১	২·৬	৫৫·৭	১১·৩	ঐ
খেঁসারী	১২·৭৩	২৪·০৮	২·৭৮	৫১·৩৮	২·৮	পার্কস্
মাষকলাই	১০·১	২২·৭	২·২	৫৫·৮	৯·২	ওয়ার্ডেন, ডিমক ও হুপার
ছোলা (আস্ত)	১১·৫	২১·৭	৪·২	৫৯·০	৩·৬	”
মটর (আস্ত)	১৫·০	২২·০	২·০	৫৩·০	২·৪	”
ছোলার দাল	৯·৫৮	২৩·৬৩	৪·৩০	৬০·০২	২·৪৪	সায়েন্স এসোসিয়েসন

খাদ্য	জল	ছানাজাতীয়	মাখনজাতীয়	শর্করাজাতীয়	লবণজাতীয়	পরীক্ষক
ভাত	৫২'৭	৫'০	'১	৪১'৯	'৩	হচিন্‌সন্‌
গোধূম	১৪'৪	১৪'৬	১'২	৬০'৯	১'৬	গটিয়ার
ময়দা	১৫'০	১১'০	২'০	৭১'২	'৮	পার্কস
ঐ	১৭'৮	১১'০	১'৬	৬৭'৫	'৭	সায়েন্স এসোসিয়েসন
আটা	১৪'৬৫	১১'৫	২'৯	৬৭'১	৩'৮৫	মেডিকেল কলেজ
যাঁতায় ভাঙ্গা আটা	১১'৬০	১২ ৮৬	৩'২১	৬৮.৫৪	২'৯৬	ডাঃ জে, এন্‌ মৈত্র
সুজি	১০'৫২	১৪'৩৮	২'১৮	৪৭'৪২	'৫১	স্বাস্থ্যসমাচার পরীক্ষাগার
লুচি	১৯'৩	৭'৫	২২'৬৪	৫০'০৩	'৫৩	ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন
রুটি (ময়ান দেওয়া)	১৭'৫৩	৯'৪৩	৩'৭১	৬০'২০	'৩৩	ঐ

দ্রব্য	জল	ছানাজাতীয় উপাদান	মাখনজাতীয় উপাদান	শর্করাজাতীয় উপাদান	লবণজাতীয় উপাদান	পরীক্ষক
গাভীদুগ্ধ (বিলাতী গরুর)	৮৬'৮	৪'০	৩'৭	৪'৮	'৭	ব্লাই
গাভীদুগ্ধ (দেশী গৃহ পালিত গরু)	৮৬'৮৭	৩'৯৭	৪'২৮	৪'৮২	'৬	সায়েন্স এসোসিয়েসন
গাভী দুগ্ধ (গড়ে)	৮৬'৪০	৩'৯৭	৪'৪০	৪'৫০	'৭৩	ডাঃ শশীভূষণ ঘোষ
গাভী দুগ্ধ (কলিকাতার বাজারের)	৯২'১৭	২'৫৭	২'২৭	২'৬০	২'৩৯	সায়েন্স এসোসিয়েসন
গাভী-দুগ্ধ (মাঠা তোলা)	৮৮'০	৪'০	১'৮০	৫'৪০	'৮	লেথ্‌বি
মহিষী-দুগ্ধ	৮১'০	৪'৪	৯'০	৪'৮	'৮	ওয়াটসন
ঐ (গড়ে)	৮১'৮	৪'৫২	৮'২	৪'৬	'৮৮	ডাঃশশীভূষণ ঘোষ
ছাগী-দুগ্ধ	৮৭'৫৪	৩'৬২	৪'২০	৪'০	'৫৬	ব্লাইদ

দ্রব্য	জল	ছানাজাতীয় উপাদান	মাখনজাতীয় উপাদান	শর্করাজাতীয় উপাদান	লবণজাতীয় উপাদান	পরীক্ষক
গাধার দুধ	৯১.১৭	১ ৭৯	১.০২	৫.৫	.৪২	ব্লাইদ্
ভেড়ার দুগ্ধ	৮২.২৭	৭.১০	৫.৩০	৪.২০	১.০	”
ঘন দুগ্ধ	২৪.৯৪	৯.৬৮	৮.৯০	৫৪.৫৩	১.০৫	হেনার
দধি (উৎকৃষ্ট)	৮৭.৮৪	৪.৭৭	৩.৫৭	২.৮	.৬২	এন, এন বসু
দধি (নাটোর)	৮৪.৯৩	৫.৬৩	৪.৮৫	২.৬৫	.৯৭	ডাঃ জে, এন্ বসু
মাখন	৭.৫	১.০	৯০.৫	...	১.০	বেল্
ছানা	৫৮ ৭২	২১.৬৮	১৬.৮	২৮.০	১.৬৮	ডাঃ জে, এন, মৈত্র
সন্দেশ (উৎকৃষ্ট)	২০.২৫	১৮.১৭	১৯.৭৫	৪০.৮	১.৬৫	সায়েন্স এসোসিয়েসন
মাঠা	৬৬.০	২.৭	২৭.৭	২.৮	১.৮	লেথ্বি

খাদ্য	জল	ছানাজাতীয়	মাখনজাতীয়	শর্করাজাতীয়	লবণজাতীয়	পরীক্ষক
হংস ডিম্ব	৭০·৫	১৩·৩	১৪·৫	•	১·৩	হচিনসন্
কুক্কুট ডিম্ব	৭৩·৫	১৩·৫	১১·৬	•	১·০	পার্কস্
ইলিশ	৭৬·৩৩	১৪·৮৫	৯·২৩	•	·৯৫	ডাঃ জে, এন্ মৈত্র
রুই	৭৪·৬০	১৮·৩৫	৯·৫৬	•	১·৪২	ঐ
কই (ছাল,কাঁটা বাদে)	৮১·৮৩	১৭·৭৩	·৪২	•	১·০৬	ঐ
ভেটকি (ঐ)	৭৭·২৭	১৬·২৬	৪·১২	•	·৮৪	ঐ
পার্শে (ঐ)	...	১৫·২৭	৬·৩২	•	·৯৭	ঐ
তপসে	৭৭·২৭	১৬·৭৬	৪·১২	•	·৮৩	ঐ
মৃগেল (ঐ)	৮০·১	১৮·০৭	·৩৩	•	১·৫	সায়েন্স এসোসিয়েসন
মাগুর (ঐ)	৭৮·৮৫	১৯·৪৯	·৫	•	১·৩	ঐ
টেংরা	৭৭·৫	১৭·২৮	·৩	•	১·১৫	ঐ
গল্‌দা চিংড়ি(মুড়া বাদে)	৮৩·০৫	১৫·৪৫	·৪৮	•	·৯০	ঐ

দ্র	জল	ছানাজ তী উপাদ	নজাতীয় উ ন	শর্করাজাতী উপাদান	লবণজাতীয় উপাদান	পরীক্ষক
লু					১·৯	পার্কস
	৮০·২		২·৩	২৩	·০৯	এ, কে, টর্ণার
আলুব খোসা					১·৮	স্বাস্থ্যসমাচার গবেষণার
বাঁধা কপি				৫·৮	·৭	পার্কস
•	৯২				·৪২	এ, কে, টর্ণার
					·৬	ডাঃ চুণীলাল বসু
হঁচোড়	৬৩		·৯৪	২৮	১·৯৫	ডাঃ জে, এন, মৈত্র
ফুলকপি	৯২				·৭	গাটিয়ার
কড়াই শুঁটি		৬·৩	৫৩		·৮১	হচিনসন
ন্য তরক ড়					...	মেডিকেল কলেজ
মুলা	৯৫·৭			৩·৩৮	·৬৪	এ, কে, টর্ণার
পিঁয়	৮৮·৯		২·৯৯	২·৫	·৪৫	ঐ

মাংস	জল	ছানাজাতীয়	মাখনজাতীয়	শর্করাজাতীয়	লবণজাতীয়	পরীক্ষক
ছাগ মাংস	...	২৪·০৬	২·৫	...	১·২	মেডিকেল কলেজ
হরিণ মাংস	৭৫·৭	১৯·৭	১·৯	...	১·১	হচিনসন
মেস মাংস (অস্থিসহ স্থূলকায় মেষের)	৪৩·৭	১৩·৫	৩৩·২	...	·৮	গটিয়ার
মেষ মাংস (নাতি স্থূলকায়)	৫০·০	১৬·০	১৬·০	...	১·০	ঐ
কুক্কুট মাংস (fowl)	৭০·০	২৩·৩	৩·১	...	১·০	হচিনসন
কাঁচা মাংসের খাক	...	১·৮	...	...	...	মেডিকেল কলেজ
রোষ্ট মাংস (Roast)	৫৪·৫	২৭·৬	১৫·৪৫	...	২·৯৫	রাঙ্ক

দ্রব্য	জল	ছানাজাতীয় উপাদান	মাখনজাতীয় উপাদান	শর্করাজাতীয় উপাদান	লবণজাতীয় উপাদান	পরীক্ষক
বরবটী কাঁচা	৯১·৯০	৩·৫০	১·২৫	৫·৭৫	১·৬	এ, কে, টর্ণার
ওল	৮০·৬০	২·২৯	২·৮৯	১২·৮	১·৪	,,
বিলাতী কুমড়া	৯৩·৪০	·৯০	১·০৩	৩·৯৬	·৭	,,
বিলাতী বেগুণ	৯৪·১৩	·৮০	·৪৯	৩·৬	...	,,
কাঁঠাল বীজ	৪৬·৪৬	১৩·১৪	১·৯৮	৩১·২০	২·২৭	এন, এন বসু
কাঁচা আম	৯০·৬৯	১·৫৯	...	৩·৩৮	·২৭	,
পাকা আম	৭৫·৫	১·২	·৭৬	১৭·৫৮	১·২	
কমলা লেবু	৮৮·২৫	০·৪৪	·২৭	৬·৬২	·৬	ডাঃ চুণীলাল বসু
কাঁঠাল	৮০.৮২	১·১৬	·৪৩	১৮·৫৮	·৯৬	জে, এন মৈত্র
কাঁঠালি কলা	৬৭·৬৮	১.০৫	·০৫	১৬·১১	·৭৭	ডাঃ চুণীলাল বসু

দ্রব্য	জল	ছানাজাতীয় উপাদান	মাখনজাতীয় উপাদান	শর্করাজাতীয় উপাদান	লবণজাতীয় উপাদান	পরীক্ষক
ড়	৯০·৪০	১·৯১	১·১১	৫·৭২	·৮	এ, কে, কর্ণার
লাউ	৯৫·৮৮	·৫৫	২·৩৬	·৯	·২৬	ঐ
বেগুণ	৯৩·৬৪	·৮৯	১·৪৮	৩·৪৮	১·৩৮	ঐ
পালং শাক	৯২·০	১·৬	...	০·৫	২·৪	ডাঃ চুণীলাল বসু
পটোল	৯০·৬৪	৫·২৪	·৩৬	৩·৮৬	·৮৪	ডাঃ জে, এন্ মৈত্র
মানকচু	৮১·২৪	১·৮২	১·৬০	১১·৯৫	১·৪৬	ঐ
কাঁচা কলা	৭০·০	১·৩১	২·৭	১৬·৮	·১৭	ডাঃ এন এন, বসু
গাজর	৮৮·১২	·৮৭	৩·০৪	৭·২৮	·৬৮	এ, কে, টর্ণার
বীটপালং	৮৩·৩০	১·৯৬	২·০১	১১·৪১	১·৩	ঐ
রাঙ্গা আলু	৭৪·১০	·৭৮	৩·৩১	২১·১৭	·৫২	ঐ

খাদ্য	জল	ছানাজাতীয়	মাখনজাতীয়	শর্করাজাতীয়	লবণজাতীয়	পরীক্ষক
চাটিম কলা	৭৩'৩২ ..	১'৫০	...	১৭'৭৮	'৭৬	ডাঃ চুনীলাল বসু
পিয়ারা (কশীর)	৮০'৯৪	...	'১১	১১'১২	'৬৬	ঐ
পিয়ারা (দেশী)	৯১'২৩	৩'১৬ (?)	'২৬	৬'৪২	'৭২	ডাঃ জে, এন্ মৈত্র
চাঁপা কলা	৭১'৪৭	১'৮০	'১৩	১৪'১৫	'৯৭	ডাঃ চুনীলাল বসু
আনারস	৯০'২৬	'৪৬	'২০	৮'১১	১'৬৮	ডাঃ জে, এন, মৈত্র
বেল	৭৮'৭৬	'৬৬	'৭২	১৬'১৪	১'১৬	ঐ
ঝুনা নারিকেল (শাঁস)	১৯'০৩	৫'৯৪	৫৩'১৪	৫'৪৬	১'৩৯	ঐ
চীনা বাদাম	২৬'১৩	২৬'১৩	৪৩'৮১	১৩'৩৮	১'৫৮	ঐ
(ঐ) ভাজা	৪'২	২৪'১	৪৭'২	৮'০	...	ডাঃ চুনীলাল বসু
আঙ্গুর	৭৪'৫২	'৫৯	...	২৪'৩৬	'৫৩	কনিগ
আপেল	৮৩'৫	'৩৯	...	৭'৭৩	'৩১	ঐ
বেদানার রস	...	'৯৩	...	৭'৬	...	মেডিকেল কলেজ

খাদ্য	জল	ছানাজাতীয়	মাখনজাতীয়	শর্করাজাতীয়	লবণজাতীয়	পরীক্ষক
আক	...	১·৫	০·৫৭	২২·১৪	...	ম্যাকারিসন্
পেঁপে	...	০·৫৭	...	৩·৩৫	...	ঐ
লিচু	...	৩·০	০·২৫	৬·৮	...	ঐ
তেঁতুল	...	১ ৪	...	৩১·২৮	...	ঐ
ডাবের জল	৯৫·৫২	১·৪১	...	৭·৬	...	সায়েন্স এসোসিয়েসন
ডালিমের রস	...	·৬১	...	৬·৫	২·৩	মেডিকেল কলেজ
চিনি	৩·০	০	০	৯৬·৫	·৫	পার্কস্
কাশীর চিনি	৩·২৬	০	০	৯৪·৪৮	০	সায়েন্স এসোসিয়েসন
দোবরা চিনি	·১০	০	০	৯৭·০	...	ঐ
গুড়	...	·২৮	...	৮৯·২	...	ম্যাকারিসন
মধু	...	·৪	...	৭২·১৮	...	ঐ
মাৎগুড়	২৩·৪	০	০	৬৯·৭	৩·৪	ব্লাইদ

পরিশিষ্ট (খ)—খাদ্যপ্রাণ তালিকা *

খাদ্য	ক	খ	গ	ঘ
ঢেঁকী ছাঁটা চাউল	+	+		
কলছাঁটা চাল	o	o	o	
আতপ চিঁড়ে	+	++	?	
মসুর (আস্ত)	+	++		
মটর (ঐ)	+	++		
দাল (অন্যান্য)	+	++		
গম	++	++	—	+
গমের ভুসি	++	++		
ময়দার রুটি (জলে ছানা)	—	+	—	—
ঐ (দুধে ছানা)	+	+	—	+
মোটা আটার রুটি (জলে ছানা)	+	++	—	+
ঐ (দুধে ছানা)	++	++	?	+
সাদা পাঁউরুটি	o	o	o	
লাল পাঁউরুটি	o	+	o	
সুজি	+	+++	o	o
আস্ত বার্লি দানা	+	+	—	
ভুট্টা	+	++	—	
ওট (জই)	+	++	—	—
রাই	+	++	?	
কাঁচা দুধ (গাভীর)	+++	++	++V	++
একবৎসা দুগ্ধ (ঐ)	+++	++	+	++
ছাগ-দুগ্ধ	+++	+	+	+

* সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগের তালিকা দৃষ্টে

খাদ্য	ক	খ	গ	ঘ
মহিষ দুগ্ধ	+++	+	+	+
মাখন-তোলা দুধ	+	+	+V	
ঘোল	+	++	+V	
ননী	+++	++	+V	
মাখন	+++	—	—	
ছানা	++	++	—	
ঘৃত	++	—	—	
মাতৃস্তন্য	++		+	
সরিষার তৈল	+	++	+	
মাছের তৈল	+	+	?	—
তৈলাক্ত মৎস্য	+++	+++		
মাছের ডিম	+	++	?	—
ছোট-মাছে		+++		
কডলিভার তৈল	+++	—	—	
হংস মাস	+	+		
পক্ষীর ডিম	+++	+		
কুক্কুট মাংস	+	+		
মেটে (যকৃৎ)	+	++	?	+
পশুর মগজ	+	++	?	+
ঐ কলিজা	+	+	+	+
মেষ মাংস	—	+++	—	+
খাসীর চর্ব্বি	++			
ছাগ মাংস	o	+++	—	?
সাদা চিনি	o	o	o	o
গুড়		•	++	

খাদ্য	ক	খ	গ	ঘ
সাগু	0	0	0	
মধু		+		
বাদাম	+	++?	X	
চিনাবাদাম	+	++?		
আখরোট	X	++	X	
নারিকেল	+	++	—	+
ডাবের শাঁস	?	+	+	+
আম		+	+	
লিচু		+	++	
পিয়ারা		+	+	
ডুমুর		+	0	
জাম		+	+	
খেজুর		+	0	
পাকা কাঁঠাল	+	?	+	+
আনারস	++	++	+++	
নাস পাতি		+	+	
শসা		+		
ডালিম		+	+	
কলা	? +	+		
তরমুজ			+	
পেঁপে	+	++		
বেল	+	?	++	
বাতাবি		++	++	
লেবুর রস	—	++	+++	
মলা লেবুর রস	+ •	++	+++	

খাদ্য	ক	খ	গ
আঙ্গুর ফল	?	++	++
আঙ্গুরের রস (বিলাতী)	?	+	+
কিস মিস		+	o
আপেল	+	++	++
টেপারী	X	X	+++
পিচফল	++	+	++
তালশাঁস	?	?	+
আমসত্ব	+	+	+
ফলের সিরাপ	o	o	o
আলু (অল্প সিদ্ধ)	+	++	++
আলুর খোসা	o	o	o
রাঙ্গা আলু	++	+	
কাঁচাকলা	+	?	++
চ্যাঁড়স	+	+++	+
এঁচোড়	+	?	?
লাউ	++	?	?
পটল		+	+
বেগুন		+	+
তেতুল		+	+
বাঁধাকপি (কাঁচা)	++	+	+++
ঐ অর্দ্ধসিদ্ধ	++	+	+
কপির আচার	X	X	+++
ফুলকপি	+	++	?
ওলকপি	—	+	+

গাজর (কাঁচা)	++	+	+	
ঐ অল্পসিদ্ধ	++	+	+V	
শালগম	—	++	+++	
মূলার শাক	++			
মূলার শাঁস	o	o	o	
মূলার খোসা			+++	
শিম (টাট্‌কা)	++	++	X	
শিম (শুক্‌না)		++		
মটর শুঁটি (টাটকা)	++	++	+++	+
অঙ্কুরিত ছোলা ও মুগ	+	++	++	
বরবটি	+	+	—	
বিলাতী বেগুন	++	+++	+++	
পেঁয়াজ	?	++	++	
রসুন	+	+	++	
লেটুয়া শাক	++	++	+++	+
পালং শাক (টাট্‌কা)	+++	+++	+++	
ধনের শাক	+	+	+	+
শুলফা শাক	+	+	+	+
পুদিনা	+	+	+	+
বিট	+	+	+	+
সয়বিন	+	++		

সাঙ্কেতিক চিহ্নের অর্থ—

+ খাদ্য প্রাণ আছে ? খাদ্যপ্রাণ থাকা সম্বন্ধে অনিশ্চিত।

++ ঐ বেশী আছে। X অজ্ঞাত V পরিবর্ত্তনশীল।

+++ ঐ খুব বেশী আছে

—ঐ নামমাত্র আছে।

সমাপ্ত